আনন্দমেলা

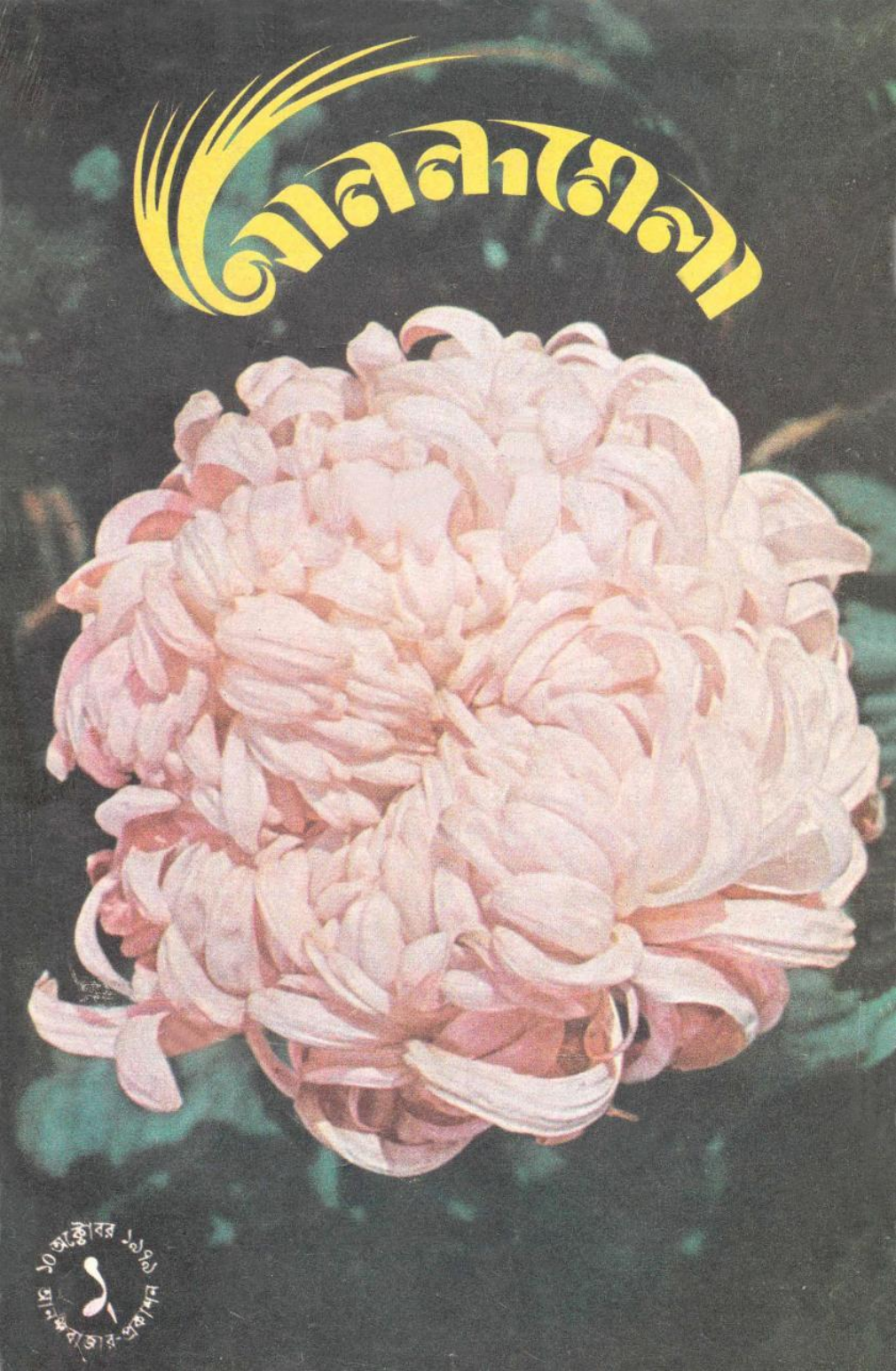

১০ অক্টোবর ১৯৭৬
আনন্দবাজার-প্রকাশন

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড বোরোলীন হাউস কলকাতা ৭০০ ০০৩

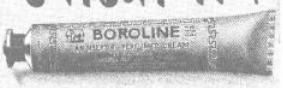

২৩ আশ্বিন ১৩৮৬ • ১০ অক্টোবর ১৯৭৯ • ৫ বর্ষ • ১০ সংখ্যা

ছড়া
নেমন্তন্ন । অন্নদাশঙ্কর রায় ৮
গুণের কদর । রঞ্জন ভাদুড়ী ২৫
দিদি যখন । সতীমোহন চক্রবর্তী ৩৩

গল্প
দৌড়বীর রণধীর । তারাপদ রায় ৯
বাঘের বুদ্ধি । শিশির মজুমদার ৪০
লোভী মানুষ ও ইঁদুর । আরতি দাস ৪৬
কুঁইমামার হাঁচি । বীরেন্দ্র দত্ত ৫৭

বিশেষ রচনা
ডেড সী'র ধারে । সর্বাণী সরকার ৪

উপন্যাস
পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৩
কে । বিমল মিত্র ২৭

আত্মকথা
খেলতে-খেলতে । চুনী গোস্বামী ৩৬

চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স
সদাশিব ১৯, রোভার্সের রয় ২০, টিনটিন ২২
বিশ্বকাপ ২৪, টারজান ২৬, বাঘা ৬০, গাবলু ৬৪

লেখাপড়া
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৪৯
মিত্র ইনস্টিটিউশনের (মেন)
প্রধান শিক্ষক কী বলেন ৬২
ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় ৬৩

খেলাধুলো
অলরাউণ্ডার কপিলদেব । অলোক দাশগুপ্ত ৫০
রেফারীর সমস্যা । পুষ্পেন সরকার ৫৩

অন্যান্য আকর্ষণ
ছবির মজা ১২, নদনদী ১৮, ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪
তোমাদের পাতা ৪৩, আঁকো ৬৬, শেখো ৬৬

প্রচ্ছদ বিপুল গুহ

সম্পাদক **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদলবরণ রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে
ছোটদের জন্য আমাদের উপহার !

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
থেকে বলছি
তোমাদের জন্য এখন আমাদের
তিন-তিনটি
চিলড্রেন্‌স
কাউণ্টার

রিচি রোড শাখা :
১৭/২ রিচি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৯

গড়িয়া শাখা :
৮২০/এ রাজা এস সি মল্লিক রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৪৭

গড়িয়াহাট শাখা :
১এ, [illegible] গার্ডেনস, কলিকাতা ৭০০ ০১৯
(প্রবেশপথ [illegible] রোড)

ভারি মজা তাই না !

■ তোমার নিজের নামে সেভিংস ব্যাঙ্ক পাশবই হবে।
■ তোমার নিজের সইতে টাকা তুলতে পারবে।

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
১৭, আর, এন, মুখার্জি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০১
চেয়ারম্যান : জে এন বিশ্বাস

Progressive—UIB—65-79

ডেড সী'র ধারে

সর্বাণী সরকার

আমরা জিনিস দেখতে কি কারও ভাল লাগে? তা নিশ্চয়ই লাগে না! আর তাই আমি যদি বলি যে, মাস কয়েক আগে আমি একটা মরা জিনিস দেখেছিলুম, আর দেখে আমার খুব ভালও লেগেছিল, তাহলে তোমরা নিশ্চয় অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু আমার কথাটা তাই বলে মিথ্যে নয়। নাও, এইবারে একটু ভেবে-চিন্তে, মাথা ঘামিয়ে বলো তো আমি কী দেখেছিলুম? পারলে না তো? বেশ, তাহলে আমার কাছেই শোনো, আমি 'মৃত সমুদ্র' অর্থাৎ 'ডেড সী' দেখে এলুম।

কী বললে? ডেড সী তো আর ভারত-বর্ষের কোনো দ্রষ্টব্য জায়গা নয় যে হুট করে চলে যাওয়া যাবে, তাই না? আর কী বললে? ডেড সী দেখতে সাধারণত কেউ যায় না, এই তো? তা এ-সব কথা আমিও জানি। তবু কিন্তু আমি গিয়েছিলুম। অবশ্য আমার যাওয়ার অনেকটাই ছিল ভাগ্যের ব্যাপার। ও কী, হিংসুটের মতো অমন কট-কট করে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন? হিংসে না-করে বরং আমার গল্পটা শুনে যাও।

আসলে হপ্তাখানেকের জন্যে আমরা ইজরায়েল ভ্রমণে গিয়েছিলুম। সেখানে হঠাৎ বাবা একদিন বলে বসলেন যে, তিনি ডেড সী দেখবেন। কিন্তু ডেড সী দেখতে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা? এদিকে বাবাও না-দেখে ছাড়বেন না। ফলে, ব্যবস্থা একটা হয়েই গেল। আর পরের দিনই দেখলুম যে, মস্ত একটা কালো গাড়িতে চড়ে বাবার সঙ্গে আমরা ডেড সী'র দিকে চলেছি।

জেরুসালেম আর ডেড সী'র মধ্যে রয়েছে একটা মরুভূমি। সেটা পেরোতে পারলেই মৃতসমুদ্রের ধারে পৌঁছে যাওয়া যায়। মরু-ভূমির মধ্য দিয়ে রাস্তা চলে গেছে, দুদিকে শুধু বালি আর বালি। যেন বালির সমুদ্র। যেতে-যেতে দু-একটা গাড়ি ছাড়া কোনো জন-মানবের চিহ্ন কোনোদিকে চোখে পড়ে না। চারদিক নিস্তব্ধ। সীমানাহীন বালি দেখলে

বরফ নয়, নুনের চাঁই

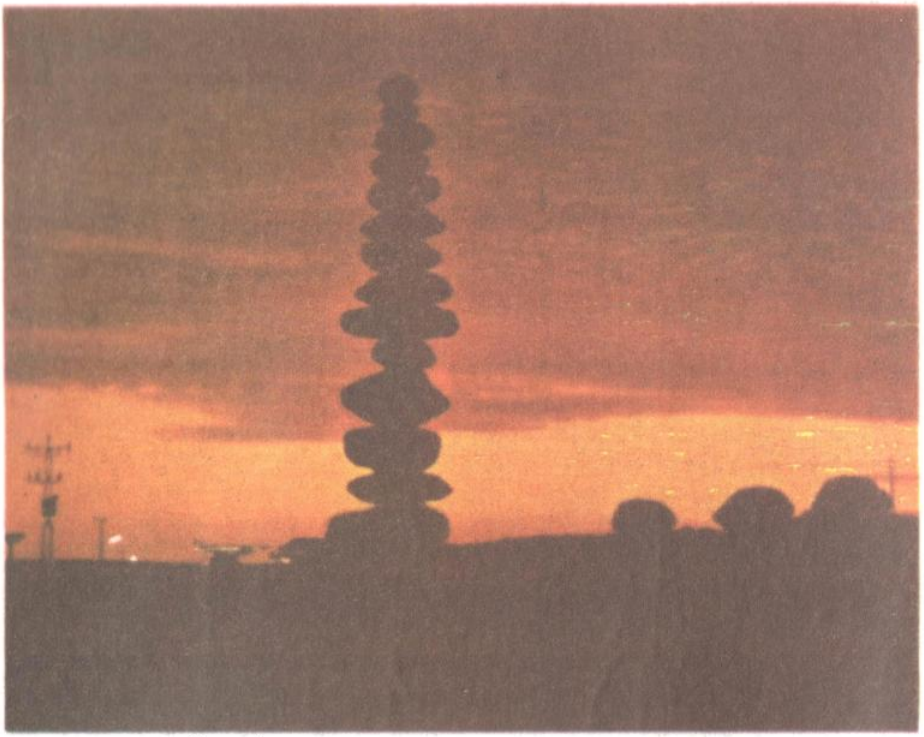

আরাদ শহরের কাছাকাছি সূর্যাস্তের সময়

মৃতসমুদ্রে গাছের কঙ্কালের উপরে নুনের আস্তরণ

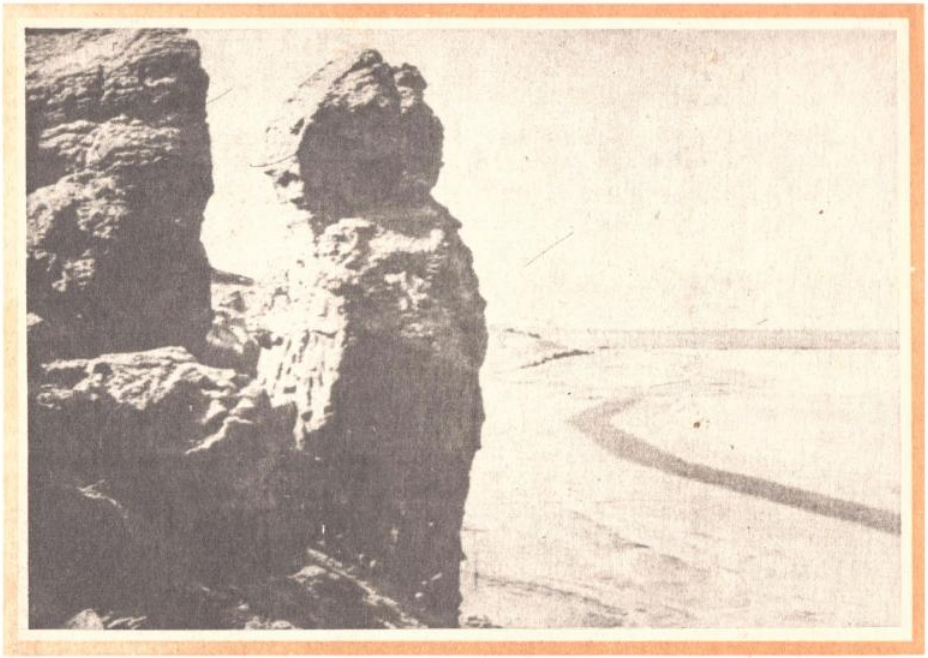

মৃতসমুদ্র

সত্যি সমুদ্রের কথাই মনে আসে, আর তখন বালির স্তূপগুলোকে সেই সমুদ্রের ঢেউ বলে মনে হয়। পার্থক্য এই যে, ঢেউগুলি এক্ষেত্রে অচল। একজনকে এ-কথা বলাতে তিনি বললেন, সত্যি তা-ই, সমুদ্রের তরঙ্গ যেন চলতে-চলতে কী দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে। এ-রকম রুক্ষ রিক্ততারও কিন্তু একটা আশ্চর্য রকমের সৌন্দর্য রয়েছে। এ-কথা আমি আগে জানতুম না। এখন স্বচক্ষে দেখে জানতে পারলুম।

খানিকটা এগোবার পরে একদল আরব বেদুইনের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গেল। এর আগে বইয়ে এদের কথা পড়েছি, কিন্তু স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ হয়নি। দলবদ্ধ হয়ে এরা ঘুরে বেড়ায়। সঙ্গে থাকে উট, ভেড়া আর ছাগল। মেয়েদের পরনে লম্বা আলখাল্লার মতো পোশাক, তার সামনের দিকটায় রঙিন সুতোয় সেলাই করা হরেক রকমের নক্‌শা, গা-ভর্তি তামা ও পুঁতির গয়না। পুরুষদের পরনে অন্যান্য আরবদের মতোই সাদা ঢিলে জোব্বা আর রুমাল দিয়ে মাথা ঢাকা। টিনটিনের গল্পে আরব বেদুইনের ছবি দেখেছি, আনন্দমেলার পাতায় তোমরাও দেখেছ নিশ্চয়, তা আজ এদের দেখে সেই ছবির কথা মনে পড়ে গেল।

দেখতে-দেখতে জুডেইন মরুভূমির শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি আমরা, ছোট-ছোট বালির পাহাড় পেরিয়ে একটু-একটু করে নীচের দিকে নামতে শুরু করেছি। তোমরা হয়তো জানো যে, ডেড সী হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪০০ মীটার নিচুতে, এটাই হচ্ছে পৃথিবীর একেবারে নিম্নতম স্থান। মরুভূমির সব চেয়ে নীচের দিকে নামতে-নামতে আমরা লক্ষ করছিলুম যে, কোন্ জায়গাটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কতটা নিচুতে, রাস্তার দু'দিকের মাইল পোস্টের উপরে তা লেখা হয়েছে। টেন মীটারস বিলো সী লেভেল...টোয়েন্টি মীটারস বিলো সী লেভেল...থারটি মীটারস বিলো সী লেভেল ...এইরকম সব লেখা পড়ে যাচ্ছিলুম আর ভাবছিলুম যে, ওরেব্বাস, অন্য কোনো জায়গা হলে তো এতক্ষণে জলের মধ্যে হাবুডুবু খেতে হত।

কতক্ষণ ধরে নামছি, খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখলুম, পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে এক চিলতে নীল যেন ঝিলিক মেরে উঠল। আমরা তো দারুণ উত্তেজিত। এবারে তাহলে ডেড সী'র

মরুভূমিতে ভেড়ার পাল। মৃতসমুদ্রের পথে

ধারে এসে পড়েছি। ঠিক তা-ই। আর মাত্র কয়েক মিনিট। তারপরেই ভূগোলের পৃষ্ঠা থেকে ডেড সী একেবারে আমাদের চোখের সামনে এসে ধরা দিল।

ডেড সী-কে অবশ্য সমুদ্র না-বলে হ্রদ বললেই ঠিক হয়। খুব বেশি চওড়া নয়। দৈর্ঘ্য অবশ্য ৭৪ কিলোমীটার। এর খানিকটা পড়ে ইজরায়েলের দিকে, খানিকটা জর্ডনের। নুনের পরিমাণ এখানে এতই বেশি যে, উদ্ভিদ বা প্রাণী জন্মাতে পারে না। একে যে মৃত-সমুদ্র বলে, সেটা এইজন্যেই। জলের মধ্যে এতই নুন যে, কোনও বস্তু এতে ডোবে না। এমন-কী মানুষও না। সবই বেলুনের মতো ভাসতে থাকে। কাছে গিয়ে দেখলুম, জলের উপরে মস্ত-মস্ত বরফের চাঁইয়ের মতো কী যেন ভাসছে। জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে, বরফ নয়, এ হল নুনের চাঙড়। দেখলে কিন্তু আইসবার্গ বলে মনে হয়। তীর-বরাবরও নুনের ছড়াছড়ি। সে-নুন জমাট বেঁধে অদ্ভুত সব আকার ধারণ করেছে। নুন গুলে গিয়ে জলের রঙ হয়েছে হাল্কা নীল। কোথাও আবার হলদে কিংবা সবুজ। এশিয়ার নিভৃত মর্মস্থলে, পাহাড়ের বলয়ের মধ্যে, মৃত এক প্রাগৈতিহাসিক জীবের মতো পড়ে রয়েছে এই জলাশয়। সে এক বিচিত্র দৃশ্য।

ডেড সী'র ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। টুরিস্ট-দের কেউ-কেউ জলে গা এলিয়ে ভাসছে। ডাক্তাররা বলেন, এই জল বাত ও অন্যান্য নানা অসুখ সারিয়ে দেয়। একটা আঙুল জলে ডুবিয়ে মুখে দিলুম। উঃ, বিচ্ছিরি তেতো স্বাদে মুখটা যেন বিষিয়ে গেল। তেতো নয়, আসলে প্রচণ্ড রকমের নোনা। রুমাল দিয়ে হাত মুছতে-মুছতে ডেড সী'র দিকে তাকালাম। স্বপ্নেও ভাবিনি যে, কখনও এখানে আসা হবে। আর কখনও কি আসব? কে জানে! মৃতসমুদ্রের সঙ্গে এই হয়তো আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ।

আস্তে-আস্তে গাড়িতে গিয়ে উঠলুম। মৃতসমুদ্রকে পিছনে ফেলে গাড়ি এগিয়ে যেতে লাগল মরুভূমির উপর দিয়ে। পিছনে তাকালুম। যতক্ষণ পারা যায়, দেখতে লাগলুম সেই সমুদ্রকে। তারপর পাহাড়ের গা ঘেঁষে আমাদের গাড়ি একটা বাঁক নিতেই ডেড সী, হয়তো চিরদিনের জন্যেই, আমার চোখের আড়ালে চলে গেল।

নেমন্তন্ন

অন্নদাশঙ্কর রায়

যাচ্ছ কোথা ?
চাংড়িপোতা।
কিসের জন্য ?
নেমন্তন্ন।
বিয়ের বুঝি ?
না, বাবুজি।
কিসের তবে ?
ভজন হবে।
শুধুই ভজন ?
প্রসাদ ভোজন।
কেমন প্রসাদ ?
যা খেতে সাধ।
কী খেতে চাও ?
ছানার পোলাও।
ইচ্ছে কী আর ?
সরপুরিয়ার।
আঃ কী আয়েস !
রাবড়ি পায়েস।
এই কেবলি !
ক্ষীর কদলী।
বাঃ কী ফলার !
সবরি কলার।
এবার থামো।
ফজলি আমও।
আমিও যাই ?
না, মশাই।

ছবি দেবাশিস দেব

দৌড়বীর রণধীর

তারাপদ রায়

সোজাসুজি দৌড়নো বিপদের সময় কোনো কাজে লাগে না, একটু আঁকাবাঁকা হয়ে ছুটতে হয়।

এই কথাটা রণধীর অল্প বয়েস থেকে শুনে আসছে। ছোটবেলায় রণধীররা একটা মফস্বল শহরে থাকত, আশেপাশের মেঠো জঙ্গল থেকে কখনো কখনো পাগলা শুয়োর সেই শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ত। তখন রণধীরের বয়েস ছিল দশ-বারো। সবাই তাকে বলেছিল, পাগলা শুয়োরে যদি হঠাৎ পথেঘাটে তাড়া করে সোজাসুজি দৌড়লে মারা পড়বে, এক মুহূর্তের মধ্যে শুয়োরে ধরে ফেলে দাঁত দিয়ে পেট চিরে ফেলবে। প্রাণে বাঁচতে চাও তো এঁকেবেঁকে ডাইনে-বাঁয়ে দুলতে দুলতে ছুটবে, শুয়োরের পক্ষে ওভাবে ছোটা সম্ভব নয়, কিছুতেই ধরতে পারবে না।

রণধীরের বাবার ছিল বদলির চাকরি। এর পরে তিনি যেখানে বদলি হয়েছিলেন সে জায়গাটা ছিল সাপের রাজ্য। নিচু জলা অঞ্চল। সাদা-কালো বিষাক্ত নিস্তেজ ছোট-বড় কত রকম সাপ যে সেখানে ছিল তার আর ইয়ত্তা নেই। এখানে এত সাপ ছিল আর এত লোক সাপের কামড়ে কাটা পড়ত যে, আলাদা করে একটা সাপের হাসপাতাল খুলতে হয়েছিল।

এখানে আসার পর যার সঙ্গেই দেখা হয়েছে সেই রণধীরকে পরামর্শ দিয়েছে, "সাপে তাড়া করলে কখনো লম্বালম্বি বা সোজা দৌড়তে যাবে না, সাপের সঙ্গে দৌড়ে পারবে না, সোজা দৌড়লে সাপ সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে, বেঁকেচুরে উল্টোপাল্টা ছুটবে।" তখন রণধীর একটু বড় হয়েছে, সে জিজ্ঞাসা করেছে, "কিন্তু সাপ সোজা ছুটবে কী করে? সাপের তো সবাই জানে সাঁপলি গতি। তার পক্ষে লম্বালম্বি ছোটা কী করে সম্ভব?"

পরামর্শদাতারা রণধীরের এই প্রশ্নে যথেষ্টই বিব্রত হয়েছে, তারা বলেছে, "সাপ যখন ধীরেসুস্থে আস্তে আস্তে চলে শুধু তখনই তার গতি সর্পিল. সাপ যখন তাড়া করে তখন তার গতি আর সর্পিল থাকে না. একেবারে সোজা হয়ে যায়।" এর পর

পরামর্শদাতাদের মধ্যে কেউ-কেউ বেশ উত্তেজিত হয়ে রণধীরকে ধমকেছে, "দ্যাখো খোকা, বেশি চালাকি করতে চেষ্টা কোরো না, সাপ তাড়া করলে সর্পিল গতিতে দৌড়বে, না হলে মারা পড়বে।"

আরেকটু বড় হয়ে রণধীর কলকাতায় কলেজে পড়তে এল, এসে উঠল ঢাকুরিয়ায় পিসির বাড়িতে। সবাই জানে, ঢাকুরিয়া পাগলা কুকুরের জন্য বিখ্যাত। ঢাকুরিয়ায় সাধারণ কুকুরেরা অর্ধ উন্মাদ, বাকি সব পূর্ণ উন্মাদ, অতি উন্মাদ। অতর্কিতে এবং বিনা কারণে, একক কিংবা দলবদ্ধভাবে, তীব্রগতিতে, প্রবল গর্জন করে নিরীহ পথচারীর দিকে ছুটে যাওয়া এই কুকুরদের প্রিয় খেলা।

সুতরাং নতুন কলকাতায় এসে শ্রীমান রণধীরকে পাগলা কুকুরদের সঙ্গে বসবাস ও দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করতে হল। দৌড়োদৌড়ি মানে রণধীর আগে দৌড়চ্ছে এবং পাগলা কুকুরেরা পিছনে দৌড়চ্ছে। কিন্তু কতবার আর পাগলা কুকুরের তাড়া এড়িয়ে পার পাওয়া যাবে। একদিন রণধীর ছুটতে গিয়ে পাশের এক পানাপুকুরের মধ্যে পড়ে গেল। এটা কোনো অভিনব ব্যাপার নয় এ অঞ্চলে, বহু লোকেই পাগলা কুকুরের ধাওয়া খেলে এই পচাপুকুরের বাঁকে এসে জলে মানে নোংরা কাদার মধ্যে পড়ে যায়। পাড়ার লোকেরা ঘটনার স্বাভাবিকতা এমনভাবে মেনে নিয়েছে যে, এ নিয়ে তারা কোনোরকম মাথা ঘামায় না। পাগলা কুকুরেরাও এর পর ইতি দেয়, শিকার জলে পড়ার পর পুকুরের পাড় থেকে যেন কিছুই ঘটেনি এ-রকম মুখ করে কুকুরেরা ফিরে যায়। এর কারণ দুটো হতে পারে। এক, পাগলা কুকুরদের জলাতঙ্ক আছে তাই তারা জলে নামে না; দুই, কাদায় মাখামাখি হয়ে শিকারের চেহারা এমন বদলে যায় যে, তারা আর তাকে চিনতে পারে না। দ্বিতীয় কারণটিই সম্ভবত সত্য, কারণ এগুলো ঠিক জলাতঙ্কগ্রস্ত পাগলা কুকুর নয়। এদের স্বভাবই পুরুষানুক্রমে এই রকম, না হলে জলাতঙ্কে ভুগে এরাই বা এতকাল বেঁচে থাকে কী করে, আর এদের কামড় খেয়ে মানুষেরাই বা বেঁচে থাকে কী করে?

এই পানাপুকুরের কাদা থেকে উঠে আসবার সময় উল্টোদিকের বাড়ির বারান্দায় চেয়ারে বসা এক ভদ্রলোক রণধীরকে ডেকে বললেন, "তুমি বুঝি এ পাড়ায় নতুন এসেছ?" কর্দমাক্ত রণধীর বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" এর পর তিনি বললেন, "সে তোমার দৌড় দেখেই বুঝতে পেরেছি। কুকুর তাড়া করলে কখনো সোজা দৌড়তে হয়? একদম এঁকেবেঁকে ছুটবে, কখনো লম্বালম্বি যাবে না।"

পাঁচ ফুট চওড়া গলির মধ্যে এঁকেবেঁকে ছোটার সুযোগ কোথায় এই চিন্তা করতে করতে রণধীর পিসির বাড়িতে ফিরল। কিছুদিন পরে বুঝতে পেরেছিল এঁকেবেঁকে ছোটা মানে রাস্তার ধারে ল্যাম্পপোস্ট বেয়ে উঠে যাওয়া কিংবা আশপাশের বাড়ির রান্নাঘরে ঢুকে যাওয়া।

এই ঢাকুরিয়া থাকার সময় থেকেই রণধীর দৌড় বিষয়ে চিন্তা শুরু করে। সে ভেবে দেখেছিল দৌড়ের দিক থেকে মানুষই সবচেয়ে অসহায় প্রাণী। টেবিল, চেয়ার, খাট ইত্যাদি প্রাণহীন চারপেয়ে বাদ দিলে যে-কোনো চতুষ্পদ জন্তুই মানুষের চেয়ে দ্রুত ছুটতে পারে। দশ গ্রাম ওজনের ইঁদুর থেকে একশো কুইন্টাল ওজনের হাতি সবাই মানুষের চেয়ে দ্রুতগামী। চিতাবাঘ, ঘোড়া, হরিণ কিংবা খরগোশ এরা তো এদের তীব্রগতির জন্যে সুবিদিত, কিন্তু অমন যে সবচেয়ে আস্তে চলে বলে বিখ্যাত কচ্ছপ, মানুষ তার চেয়েও জোরে ছুটতে পারে না। একবার রণধীর স্বচক্ষে দেখেছিল জেলেরা নদীর চড়ায় মাছ ধরছে, তাদের জালে একটা কচ্ছপ উঠেছে, সেই কচ্ছপটাকে তারা তাদের ঝুড়িতে রেখেছে, হঠাৎ কচ্ছপটা ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল। সে কী তীব্র গতি কচ্ছপের, কচ্ছপের সেই গতি দেখলে ঈশপসাহেব তাঁর খরগোশ ও কচ্ছপের গল্প নতুন করে লিখতেন। দুজন ক্ষিপ্র জেলে প্রাণপণ ছুটল কচ্ছপটার পিছনে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা, কচ্ছপটা বিদ্যুৎবেগে জলে গিয়ে নেমে পড়ল।

শুধু চারপেয়ে জন্তুই বা কেন, দুপেয়ে একটা হাঁস, এমনকী সামান্য মুরগির বাচ্চা—সেটাকে পর্যন্ত ছুটে ধরা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এবং সত্যিই একবার মামার বাড়িতে ছেলেবেলায় একটা দুর্দান্ত পাজি মোরগ রণধীরকে তাড়া করে আক্রমণ করেছিল। দৌড়ে আত্মরক্ষা করতে পারেনি সে, মোরগটা তাকে ধরে ফেলে এবং পায়ে ঠুকরে দেয়।

কুকুরের তাড়ায় পানাপুকুরে পড়ে যাওয়ার পর থেকে রণধীরের মাথায় দৌড়চিন্তা প্রবলভাবে দেখা দেয়। ইতিমধ্যে অবশ্য আরো একটি ঘটনা ঘটেছিল। ময়দানে কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ফুটবল খেলার টিকিট সংগ্রহ করতে গিয়েছিল সে, সেখানে ভরদুপুরে মাউন্ট পুলিসের পাল্লায় পড়ে। বেশ শান্তভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল তারা বন্ধুবান্ধব মিলে। হঠাৎ একদল লোক দলবদ্ধভাবে লাইনের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দেয়, ঠিক পিছনে-পিছনে আসে মাউন্টপুলিস। মাউন্টপুলিসের ঘোড়া সামনের পা দুটো উঁচু করে তুলতেই রণধীর প্রাণভয়ে দৌড় দেয়। তার বন্ধুরা চালাক তাই গা বাঁচিয়ে সরে দাঁড়ায়, রণধীর ছুটতে থাকে—পিছনে মাউন্টপুলিসের ঘোড়া। রণধীরের চারপাশে অসংখ্য অপরিচিত শুভানুধ্যায়ী চেঁচাতে থাকে, "দাদা, সোজাসুজি দৌড়বেন না, এঁকেবেঁকে দৌড়ন। দাদা, সোজা দৌড়লে ঘোড়া ধরে ফেলবে।"

এই সব পরামর্শের বলেই হোক অথবা নিজ কৃতিত্বেই হোক, জনস্রোতের মধ্যে এঁকেবেঁকে ছুটে সেদিন রণধীর আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়।

প্রাক্তন সমস্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই ঘটনা রণধীরের জীবনে মোড় ফিরিয়ে দিল। এর পর থেকে তার আর কলেজের লেখাপড়ায় তত মন নেই। তার একমাত্র চিন্তা, মানুষ কেন জোরে দৌড়তে পারে না। অনেকরকম ভাবনাচিন্তা করে এবং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করে রণধীর বুঝতে পারল. মানবজাতির দৌড়ের বেগ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো দু-চার-দশ বছরে রীতিমত অসম্ভব। কিন্তু বিপদে পড়লে দৌড়নোই যখন একমাত্র উপায়, তখন অবশাই একটা কিছু করা বিশেষ দরকার।

এই সময়েই রণধীর সোজাসুজি না দৌড়ে এঁকেবেঁকে দৌড়নোর যত উপদেশ সারা জীবনে শুনেছে তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল। সোজা দৌড়ে সম্ভব না হলে কায়দা করে দৌড়তে হবে। কিন্তু তার আগে রণধীর বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচাই করল সমস্ত ব্যাপারটা।

প্রতিদিন সকালে রবীন্দ্রসরোবরে চলে আসত সে। এখানে কয়েক ঘণ্টা ধরে গবেষণা করত। প্রথমে তার মাথায় বুদ্ধি আসে মানুষ যদি জীবজন্তুর মতো চার পায়ে দৌড়ত, মানে সামনের দুই পা হাতের মতো ব্যবহার করে শিশুরা যেভাবে হামাগুড়ি দিয়ে ছোটে, মানুষ যদি সেইভাবে ছুটতে পারে তা হলে হয়তো মানুষের দৌড়ের গতি বাড়বে। ছোট ছোট শিশু হামাগুড়ি দিয়ে কী দ্রুত চলে যায়, রণধীর সেটা লক্ষ করেছিল, মানুষ যদি এই অভ্যেসটা সারাজীবন বজায় রাখতে পারে তাহলে খুবই উপকার হয় মানবজাতির। আর তাছাড়া দুই পায়ে যদি ঘণ্টায় বারো মাইল বেগে ছুটতে পারে মানুষ, চার পায়ে ঘণ্টায় চব্বিশ মাইল বেগে ছুটবে এ তো একেবারে সহজ ঐকিক নিয়ম।

সুতরাং পাঁচ-ছয় মাস রণধীর চারপায়ে দৌড়ল। এই সময় যাঁরা রবীন্দ্রসরোবরে সকালে বেড়াতে যেতেন সবাই রণধীরকে চিনে ফেলেছিলেন। গাছপালার আড়াল থেকে লেকের পাড় দিয়ে দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে একটি যুবক ছুটে আসছে—প্রথম প্রথম এই দৃশ্য দেখে কেউ কেউ রীতিমত ঘাবড়ে গেছেন। পরে রণধীরের সঙ্গে অল্পাবিস্তর আলাপ হওয়ার পর তাঁরা বুঝতে পেরেছেন এর মধ্যে রহস্যময় বা বিপজ্জনক কিছু নেই। দু-একজন অবসরপ্রাপ্ত বায়ুসেবনকারী বৃদ্ধ ভদ্রলোক রণধীরের গবেষণায় যথেষ্ট উৎসাহও দেখালেন।

কিন্তু রণধীরের ঐকিক নিয়মে ভুল হয়ে গিয়েছিল, দুই পায়ে বারো মাইল অনুযায়ী চার পায়ে চব্বিশ মাইল না হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তার সর্বোচ্চ গতি দাঁড়িয়েছিল ঘণ্টায় ছয় মাইল। অবশ্য একজন উৎসাহদাতা বৃদ্ধ বলেছিলেন হামাগুড়ির গতির রেকর্ড হিসেবে ছয় মাইল খুবই বেশি এবং সম্ভবত সর্বোচ্চ। এ বিষয়ে অন্য কোথাও কোনো রেকর্ডের উল্লেখ না থাকায় রণধীর কোথাও কোনো দাবি জানাতে পারেনি।

তবে মাস পাঁচেকের মাথায় রণধীরের হাঁটুতে দগদগে ঘা দেখা দেয়। তখন হামাগুড়ি দিতে গেলে রক্তারক্তি হয়ে যেত। এই সময় রণধীর শুধু হাতে দৌড়নো শুরু করে।

মাথা নীচের দিকে দিয়ে পা উপরে তুলে হাতের উপর ভর দিয়ে চলা—এটা তেমন কোনো নতুন জিনিস নয়, একে বলে পাঁকক্ রেস

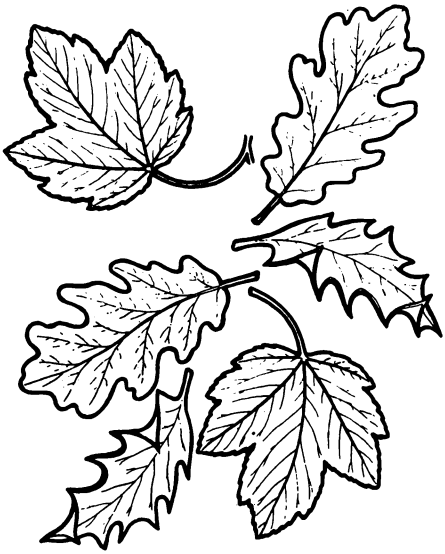

তিন জোড়া পাতা আছে এখানে। তোমার ছোট ভাই কিংবা বোনকে বলো, মিলিয়ে-মিলিয়ে জোড়া-তিনটিকে সে আলাদা করে ফেলুক।

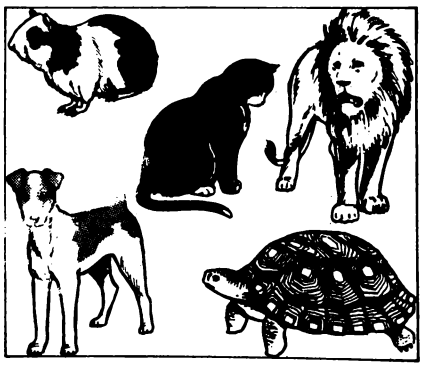

পাঁচটি প্রাণীর মধ্যে চারটি পোষ মানে; কিন্তু একটি সহজে পোষ মানে না। তোমার ছোট ভাই কিংবা বোনকে জিজ্ঞেস করো, সেটি কোন্‌টি। ঠিকঠাক বলতে পারলে তাকে একটা লজেন্স দিও।

বা ময়ূর-দৌড়। অনেক ইস্কুলে বা ক্লাবে ময়ূর-দৌড়ের প্রতিযোগিতা হয়। তাই রণধীর বেশি দিন নিজে কষ্ট করে পাঁকক রেস না করে এই রকম একটা ক্লাবে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে যায়।

ততদিনে রণধীরের খ্যাতি অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। ঐ ক্লাবে পৌঁছে রণধীর যেইমাত্র জানতে চেয়েছে 'এখানে ময়ূরদৌড় হয় কি না', অমনি ক্লাবের লোকেরা চিনতে পেরেছে, এই সেই ব্যক্তি যে রবীন্দ্রসরোবরে হামাগুড়ি দিয়ে দৌড়য়। রণধীরের প্রশ্নের উত্তরে তারা বলল, "এখানে ময়ূরদৌড় হয়, তবে কুকুরদৌড় হয় না।"

শুধু এখানেই নয়, আরো বহু জায়গায় অল্পবিস্তর অপমানিত হল রণধীর। দু-একজন তরল প্রকৃতির বালক রণধীরের চতুষ্পদ দৌড়ের কথা স্মরণ রেখে মাঝেমধ্যেই রাস্তাঘাটে রণধীরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল. "দাদা, লেজ বেরিয়েছে?"

হাঁটুতে ঘা, কোমরে ব্যথা এবং হৃদয়ে অপমান বহন করে রণধীর এখন দিন কাটাচ্ছে। ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে তবু সে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। সামনে একটা লাফ দিয়ে, তীব্র বেগে বাঁয়ে ঘুরে তারপর শূন্যে পাক খেয়ে সে এখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তীব্র গতিতে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কোনো জীবজন্তু তাড়া করলে বুঝতেই পারবে না যে রণধীর ছুটছে না, ফলে তারা সামনে ছুটে যাবে আর রণধীর যথাস্থানে পড়ে থাকবে। আঁকাবাঁকা ছুটে যাওয়ার জন্যে অনেক জায়গা দরকার পড়ে, এভাবে ছুটলে যেখানে আছ সেখানে দাঁড়িয়েই ছোটা যায়।

ইতিমধ্যে লোকের মুখে মুখে ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়েছে। সহানুভূতিশীল উদ্যোক্তার অভাব কলকাতায় নেই। আরেকটু গুছিয়ে নিয়েই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দৌড়বীর রণধীরের দৌড় শিক্ষার আসর শুরু হবে। প্রত্যেক রোববার সকালে রণধীরদের পাড়ার মধ্যে এই আসর বসবে। আত্মরক্ষার অভিনব উপায় শিক্ষার এই আসরের মাসিক মাইনে মাত্র পঁচিশ টাকা ধার্য হয়েছে।

আমরা রণধীরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি এবং সেই সঙ্গে প্রার্থনা করি তার হাঁটুর ঘা তাড়াতাড়ি সেরে যাক।

ছবি রতন সেন

পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে ঃ

সন্তু আর কাকাবাবু এবার অভিযানে বেরিয়েছে হিমালয় পাহাড়ে, এভারেস্ট-চূড়ার দিকে। ওরা এখন আছে গেরখপেপ নামে একটি জায়গায়। সেখানে চারদিকে বরফ, তার মধ্যে একটা বহু পুরনো গম্বুজ। কাকাবাবু এবার কোনু রহস্যের সন্ধানে এসেছেন, তা খুলে বলছেন না। তিনি সঙ্গে এনেছেন একটা কাচের বাক্স, তার মধ্যে মানুষের দাঁতের মতন বিরাট বড় একটা দাঁত। কাকাবাবু রোজ সন্ধের পর সেই গম্বুজের চূড়ায় বসে চোখে দূরবিন লাগিয়ে চেয়ে থাকেন। একদিন বিকেলে মিংমা নামে একজন শেরপার সঙ্গে সন্তু আর কাকাবাবু বরফের ওপর দিয়ে হাঁটছিলেন, এই সময় সন্তু একটু পিছিয়ে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল আর বরফের মধ্যে ঢুকে যেতে লাগল। তারপর—

৭

বরফের মধ্যে ঢুকে যেতে যেতে সন্তু ভাবল, এই তার শেষ। কাকাবাবু আর মিংমা তাকে দেখতে পাচ্ছে না, তার আর বাঁচার আশা নেই।

কিন্তু মানুষ সব সময় বাঁচার জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে। সন্তুর দম আটকে আসছে, তবু সে পা দুটো বেঁকিয়ে নিজেকে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। এক সময় তার মাথা ঠেকল কিসে যেন। বরফের নীচে নিশ্চয়ই শক্ত পাথর আছে।

তখন সন্তু পায়ের চাপ দিয়ে মাথাটা তুলতে লাগল। সম্পূর্ণ মুখটা যখন বাইরে এল তখন মনে হল, আর এক মুহূর্ত দেরি হলে নিশ্বাসের অভাবে সন্তুর বুকটা বুঝি ফেটে যেত। সে হাঁপাতে লাগল জোরে জোরে।

আজও কিন্তু সন্তু বাঁচল না। আলগা বরফের মধ্যে গেঁথে যেতে লাগল তার পা দুটো। ঠিক যেমন চোরাবালির মধ্যে মানুষ আস্তে আস্তে ডুবে যায়। সন্তু চিৎকার করল, "কাকাবাবু! মিংমা—!"

ওরা দুজনে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিল। ডাক শুনে ফিরে তাকাল।

কাকাবাবুর সব সময় মনে থাকে না যে, তিনি খোঁড়া। সন্তুকে ঐ অবস্থায় দেখে তিনি দৌড়ে আসতে গেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ধপাস করে পড়ে গেলেন তিনি নিজেই। তিনি বলে উঠলেন, "মিংমা, আমাকে তোলবার দরকার নেই, তুমি সন্তুকে ধরো!"

মিংমা কিন্তু দাঁড়াল না। সে দৌড়োবার বদলে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোতে লাগল সন্তুর দিকে। মিংমা অনেক রকম কায়দা জানে। খানিকটা ঐভাবে এসে সে হঠাৎ শুয়ে পড়ল, তারপর গড়াতে গড়াতে সন্তুর কাছে এসে বলল, "সন্তু সাব, হামারা হাত পাকাড়ো!"

চোরাবালির মতন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেই বেশি বিপদ, তাই মিংমা শুয়ে পড়েছিল। সেই অবস্থায় সে সন্তুর হাত ধরে টেনে তুলল। তারপর দুজনেই গড়িয়ে গড়িয়ে চলে এল দূরে। কাকাবাবুও সেখানে চলে এসেছেন ততক্ষণে।

সন্তু বলল, "ক্রেভিস! ওখানে ক্রেভিস আছে, আমি তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম!"

কাকাবাবু খানিকটা ধমকের সুরে বললেন, "তুই আমাদের সঙ্গে আসছিলি, আবার ওদিকে গেলি কেন?"

"ওখানে একটা ফুলগাছ দেখেছিলাম!"

"ফুলগাছ? এই বরফের মধ্যে আবার ফুলগাছ আসবে কোথা থেকে?"

"হ্যাঁ সত্যি সত্যি দেখেছিলাম। আমি হাত দিয়ে ধরেওছিলাম সেটাকে। তারপর বরফের মধ্যে ডুবে গেলাম!"

মিংমা বলল, "কভি কভি হোতা হ্যায়। একঠো দোঠো গাছ ইধার উধার হোতা হ্যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "বরফের মধ্যেও এ-রকম চোরাবালির মতন ব্যাপার থাকে? এ তো খুব সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! কেইন শিপটন তাহলে এ-রকমই একটা কিছুর মধ্যে পড়ে মারা যেতে পারে!"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, ওটা কিন্তু খুব গভীর নয়। আগে তো আমি উল্টোভাবে পড়েছিলুম, মাথাটা ঢুকে গিয়েছিল, তারপর মাথাটা এক জায়গায় ঠেকে গেল। নইলে তো আমি উঠতেই পারতুম না!"

মিংমা বলল, "মাথাটা ঢুকে গিয়েছিল? বহুত জোর বাঁচ গিয়া!"

সন্তুর শরীরে কোথাও আঘাত লাগেনি বটে, কিন্তু তার সারা শরীর তখনো থরথর

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কিশোর-কাহিনী

● বিশ্বের বিখ্যাত অনেক কিশোর উপন্যাস ● ছোটদের সব রকমের সব স্বাদের সেরা গল্প—ভূতের, হাসির, গোয়েন্দা, অ্যাডভেঞ্চার ● সত্যি শিকার-কাহিনী, ভৌগোলিক অভিযান, ডাকাতির কথা, যুদ্ধক্ষেত্রের গল্প, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী ● দেশ বিদেশের পৌরাণিক কাহিনী, লোক-গল্প ও রূপকথা ● ঈশপ-ক্রিলভ-পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নীতিগল্প, পশুপাখির অন্যান্য গল্প, ● মহাকাব্য ও প্রাচীন কাব্যের গল্প, যেমন—ইলিয়াড, ওডেসি, বিওউলফ, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সাগা, শাহনামা, ইগর সাগা, ভারতীয় মহাকাব্যের গল্প, বাই-বেলের গল্প ● সেক্সপীয়র ও কালি-দাসের নাটকের গল্প ● আরব্য রজনী ও কথাসরিৎসাগরের কাহিনী।

প্রতি খণ্ডের গ্রাহক-মূল্য ২০ ০০। গ্রাহক-চাঁদা ১০·০০। গ্রাহক-চাঁদা শেষ খণ্ডের মূল্য থেকে বাদ যাবে। এককালীন গ্রাহক-মূল্য ২০০·০০ টাকা। ডাকে বই নিলে আলাদা ডাকমাশুল। এককালীন গ্রাহকের প্রতি খণ্ডের জন্য ৩·০০ টাকা করে ডাকমাশুল। টাকা নিজে এসে, মানি অর্ডারে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে (চেকে নয়) দিতে হবে। প্রতি খণ্ডে প্রায় ৫০টি ছবি—ভালো কাগজ, ভালো বাঁধাই। গ্রাহক নেওয়া হচ্ছে। শেষ তারিখ : ১৫. ৯. ৭৯ ১ম খণ্ড পূজার আগে বেরুবে।

গ্রন্থনিলয়

৫৯/১ বি পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯

করে কাঁপছে। একদম মৃত্যুর মুখোমুখি হলে এ-রকম হয়। সে মিংমাকে শক্ত করে চেপে ধরে রইল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সেই ফুল-গাছটা কোথায় গেল?"

সন্তু বলল, "সেটা বরফের মধ্যে চাপা পড়ে গেছে।"

কাকাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "এখানে একটা কিছু চিহ্ন দেওয়া দরকার। আবার যাতে কেউ ভুল করে ওখানে না যায়—"

কিন্তু কী দিয়ে চিহ্ন দেওয়া হবে? এখানে কোনো কাঠের টুকরো কিংবা পাথর-টাথরও কিছু নেই। মিংমাই বুদ্ধি বার করল একটা।

সে বসে পড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ মুঠোয় ভরে টিপে টিপে শক্ত করে একটা মূর্তি বানাতে লাগল। দেখতে দেখতে সেটা বেশ একটা ছোটখাটো গোরিলা কিংবা বাঁদরের মতন মূর্তি হয়ে উঠল।

মিংমা হাসতে হাসতে বলল, "দেখিয়ে সাব, এক টিজুটি বন গিয়া। নরবু কাঠের পুতুল বানায়, আমিও বরফের পুতুল বানাতে পারি।"

সন্তু আপন মনেই বলে উঠল, "ইয়েতির ছোটভাই টিজুতি!"

মিংমা গলা থেকে তার লাল রঙের রুমালটা খুলে নিয়ে সেটা পরিয়ে দিল ঐ বরফের মূর্তিটার গলায়। তারপর সেই মূর্তিটাকে তুলে সাবধানে কিছুটা এগিয়ে এক জায়গায় বসিয়ে দিল।

কাকাবাবু বললেন, "ওটা আর কতক্ষণ থাকবে। কাল রোদ্দুর উঠলেই তো গলে যাবে!"

মিংমা বলল, "কাল আমি এসে একঠো বড় ফ্ল্যাগ লাগিয়ে দিয়ে যাব ইধারে। কুলি লোগ্ আজ কেউ আসবে না এ সাইডে।"

কাকাবাবু বললেন, "আজ আর কালা-পাথরে যাওয়া যাবে না। এক্ষুনি সন্ধে হয়ে যাবে। চলো, বেস ক্যাম্পের দিকে ফিরে চলো!"

গম্বুজে ফিরে এসে সন্তু স্যান্ডউইচ আর কফি খেয়ে শুয়ে পড়ল। তার শরীর এখনো দুর্বল লাগছে।

সন্তু ঘুমিয়েও পড়ল তাড়াতাড়ি। কাকা-

বাবু আলো জেবলে পড়াশুনো করতে লাগলেন।

এক সময় একটা স্বপ্ন দেখল সন্তু।

সে একা চুপি চুপি কাকাবাবুকে না জানিয়ে গম্বুজ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে মাঝরাতে। তার এক হাতে একটা শাবল আর অন্য হাতে একটা টর্চ। গম্বুজের সামনের তাঁবুগুলোর পাশ দিয়ে সে এগিয়ে গেল নিঃশব্দে। মালবাহকরা সবাই ঘুমোচ্ছে। শুধু একটা তাঁবু থেকে ভেসে আসছে মাউথ অর্গানের আওয়াজ। নিশ্চয়ই মিংমা। শুয়ে শুয়েও সে মাউথ অর্গান বাজায়।

সন্তু হাঁটতে হাঁটতে চলে এল বিকেল-বেলায় সেই জায়গাটায়। মিংমার তৈরি বরফের পুতুলটা ঠিকই আছে। গলায় বাঁধা লাল রুমাল। মিংমার কায়দায় সন্তুও সেখানে শুয়ে পড়ে, তারপর গড়াতে গড়াতে মূর্তিটা ছাড়িয়েও এগিয়ে গেল খানিকটা। তারপর শাবল দিয়ে বরফ খুঁড়তে লাগল। একটা দারুণ জিনিস আবিষ্কার করে কাকাবাবুকে সে চমকে দেবে! বরফ সরিয়ে সরিয়ে সে খুঁজতে লাগল ফুলগাছটা। অবশ্য শুধু ফুলগাছটা খুঁজতেই সে এখানে আসেনি। এ জায়গায় বরফের নীচে যে গর্ত, তা খুব গভীর নয়। এক জায়গায় সন্তুর মাথা ঠেকে গিয়েছিল। কিন্তু মাথা ঠেকে গিয়েছিল কিসে? তখন সে পাথর বলেই ভেবেছিল, কিন্তু পরে তার মনে হয়েছিল, সেটা যেন একটা লোহার পাত। লোহা ছুঁলে আর পাথর ছুঁলে আলাদা আলাদা রকম লাগে। জনমানবশূন্য জায়গায় বরফের নীচে লোহার পাত?...

খুঁড়তে খুঁড়তে সন্তু ঠং করে একটা শব্দ শুনতে পেল। আনন্দে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল তার। তবে তো সে ঠিকই বুঝেছিল! কাকাবাবু যখন শুনবেন.....। উৎসাহের চোটে সে আরও জোরে জোরে খোঁড়বার চেষ্টা করতেই শাবলটা তার হাত থেকে পড়ে গেল গর্তের মধ্যে। সেটাকে তুলতে যেতেই সন্তুর মাথাটা আবার ঢুকে যেতে লাগল ভেতরে।

স্বপ্নের মধ্যেই সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, "আহ্, আহ্!"

তারপরই সে ভাবল, আমি কি স্বপ্ন দেখছি? নিজেই আবার উত্তর দিল, কই, না তো, এই তো আমার মাথাটা ঢুকে যাচ্ছে বরফের মধ্যে অমি মরে যাচ্ছি।

তারপর সে চোখ মেলে দেখল, আলো জ্বলছে! কোথাকার আলো? কিসের আলো?

এবার ভাল করে সন্তুর ঘুম ভাঙল। সে বুঝতে পারল, সে শুয়ে আছে গম্বুজের মধ্যে. স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে। বাবাঃ, কী একটা

সাধারণ পরিষ্কার করার পাউডার ব্যবহার করার পর
কিছু আবর্জনা গুঁড়ো থেকে যাওয়া সম্ভব

ভিম আনে নিখুঁত ঝলমলে চমক !

এর মধ্যে আছে দেড়গুণ পরিষ্কার করার ক্ষমতা

ভিমে আছে পরিষ্কার করার যে কোনো পাউডারের চেয়ে বেশী ডিটারজেন্ট। তাই এর বাড়তি পরিষ্কার করার ক্ষমতা—তেলাভাব আর সমস্ত দাগ নিমেষে সাফ করে দেয়, কোনো গুঁড়ো অবশিষ্ট রাখে না। তা ছাড়া ভিম অতি-মিহি ও মোলায়েম হওয়ার ফলে পরিষ্কারও ভালো হয় অথচ আঁচড় পড়ে না। ভিম ব্যবহারে সব কিছু ঝলমলে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আপনার ২৫% দাম বাঁচবে এই প্যাক কিনলে

হিন্দুস্থান লিভারের এই উৎকৃষ্ট উৎপাদন কেবল ৬০০ গ্রাঃ ও ২.৫ কেজি প্যাকে পাওয়া যায়, কখনও খোলা বিক্রী হয় না।

সিনটাস-V.56-2115 BG

অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিল সে! বরফের নীচে লোহার পাত, এ কখনো হয়?

পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখল, কাকাবাবু তাঁর বিছানায় নেই।

আবার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল সন্তুর। এত রাতে কাকাবাবু কোথায় গেলেন? স্বপ্নের মধ্যে সন্তু একা একা বরফ খুঁড়তে গিয়েছিল। কিন্তু সত্যি সত্যি তো কেউ একা একা এখানে বাইরে যায় না রাত্তিরবেলা।

সে ডেকে উঠল, "কাকাবাবু!"

অমনি গম্বুজের ওপর থেকে কাকাবাবু উত্তর দিলেন, "কী হল?"

কাকাবাবু এত রাতেও গম্বুজের ওপরে বসে আছেন? কোনো মানে হয়? উনি কি রাতে একটুও ঘুমোবেন না? এ-রকম করলে শরীর খারাপ হবে যে।

"কাকাবাবু, এখন কটা বাজে?"

"সাড়ে নটা। কেন?"

এখন রাত মোটে সাড়ে নটা? যাঃ! সন্তুর ধারণা সে বহুক্ষণ ঘুমিয়েছে। স্বপ্নটাই তো দেখল কতক্ষণ ধরে। কলকাতায় রাত সাড়ে নটার সময় কত রকম আওয়াজ। কলকাতা এখান থেকে কত দূরে!

খুব অস্পষ্টভাবে মাউথ অর্গানের শব্দ শোনা যাচ্ছে বাইরে। মিংমা বাজাচ্ছে। সন্তু স্বপ্নের মধ্যেও এই শব্দটা শুনেছিল। আশ্চর্য না!

সন্তু একবার ভাবল, কাকাবাবুকে স্বপ্নটার কথা বলবে। তারপরই আবার ভাবল, না, দরকার নেই। কাকাবাবু নিশ্চয়ই হেসে উঠবেন। বরফের নীচে লোহার পাত! কাকাবাবু তাকে পাগলও মনে করতে পারেন। অথচ, সন্তুর এখনো স্বপ্নটাকে ভীষণ সত্যি বলে মনে হচ্ছে।

একটু বাদে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন ভোরের নীল রঙের আলো গম্বুজের জানলা দিয়ে ভেতরে এসে পড়েছে। কাকাবাবু গভীরভাবে ঘুমিয়ে আছেন।

স্লিপিং ব্যাগ থেকে বাইরে বেরিয়েই সন্তু লাফাতে লাগল। ঠিক স্কিপিং করার মতন। বিছানা ছাড়ার পর প্রথম যে শীতের কাঁপুনিটা লাগে, সেটা এইভাবে তাড়াতে হয়। বেশ কিছুক্ষণ লাফালে শরীরটা আস্তে আস্তে গরম হয়ে ওঠে।

সন্তুর লাফালাফির শব্দ শুনে কাকাবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি চোখ মেলে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "শরীর ভাল আছে তো?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, খুব ভাল আছে।"

"কাল রাতে তুই একেবারে অঘোরে ঘুমিয়েছিস। তোকে দু-তিনবার ডাকলুম—"

"আপনি আমায় ডেকেছিলেন?"

"হ্যাঁ। কাল আমি একটা আশ্চর্য জিনিস দেখেছি। তোকেও দেখাতে চেয়েছিলাম—"

কাকাবাবু স্লিপিং ব্যাগের চেন টেনে খুললেন। তারপর উঠে বসে বললেন, "আমার ক্রাচ দুটো এগিয়ে দে তো!"

সন্তু ক্রাচ দুটো তাড়াতাড়ি নিয়ে এসে উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করল, "কী দেখেছেন কাল রাত্রে?"

"দুটো আলোর বিন্দু। অনেক দূরে, প্রায় কালাপাথরের কাছটায়। চোখের ভুল নয়, ভাল করে দেখেছি।"

"আলোর বিন্দু? ওখানে আলো আসবে কোথা থেকে?"

"সেই তো কথা! আমাদের লোকরা রাত্রে অতদূরে যাবে না। আলোর বিন্দু দুটো খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে হঠাৎ আবার মিলিয়ে গেল। ধরা যাক, ইয়েতি বলে যদি কোনো প্রাণী থেকেও থাকে, তা হলেও, ইয়েতিরা আলো নিয়ে ঘোরাফেরা করে, এ-রকম কখনো শোনা যায়নি!"

"কাকাবাবু, আলেয়া নয় তো?"

কাকাবাবু আপন মনে আস্তে আস্তে বললেন, "বরফের মধ্যে আলেয়া? কী জানি! সেটাও ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে!"

(ক্রমশ)

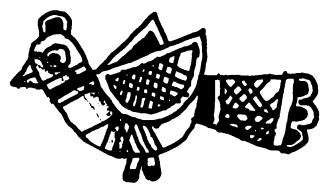

ডানিয়ুব

দিদিমণি

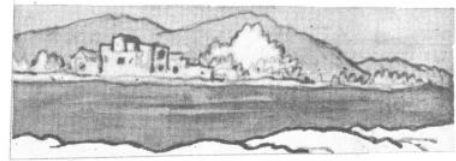

ভলগার পর ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদীর নাম ডানিয়ুব। পশ্চিম জার্মানির ব্ল্যাক-ফরেস্ট পাহাড় থেকে এই নদী বেরিয়েছে এবং ১,৭৭০ মাইল বা ২,৮৫০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে কৃষ্ণসাগরে গিয়ে পড়েছে। এই নদীটি আটটি রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে এবং এই সব রাষ্ট্রে নদীটিকে ছটি ভিন্ন নামে ডাকা হয়। পশ্চিম জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ায় এই নদীটিকে বলা হয় ডোনাউ, চেকোস্লোভাকিয়ায় বলা হয় ডুনাজ, হাঙ্গারিতে বলা হয় ডুনা, যুগোস্লাভিয়া এবং বুলগারিয়াতে বলা হয় ডুনাভ, রুমানিয়ায় বলা হয় ডুনারিয়া এবং সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রে বলা হয় ডুনে। এতগুলি রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বলে নদীটির রাজনৈতিক গুরুত্ব খুব বেশি। মধ্য ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে এর দুই পাশে আছে অনেক দুর্গ ও প্রাসাদ। একসময় অনেকগুলি রাষ্ট্রের মধ্যে এই নদীটিই ছিল সহজে যাতায়াত করবার জলপথ। এই নদীটিকে নিয়ে অনেক গান লেখা হয়েছে। এই শতাব্দীতেও এই নদীটিকে বাণিজ্যের জন্যে খুব বেশি ব্যবহার করা হয়। নদীর উচ্চভাগ থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। ভিয়েনা, বুদাপেস্ট, বেলগ্রেড—সব শহরই তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে ডানিয়ুবের ওপর নির্ভরশীল।

একদা এই নদীর দ্বারা রোমান সাম্রাজ্যের উত্তর-সীমা চিহ্নিত হত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য খুব বাধা পেয়েছিল। ১৯৪৮ সালে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের একটি প্রস্তাবে ডানিয়ুব কমিশনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, কেবল ডানিয়ুবের তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলিই এই নদীকে বাণিজ্যের জন্যে ব্যবহার করতে পারবে।

ডানিয়ুব নদীর অববাহিকা ৩১৫,০০০ বর্গ মাইল বা ৮১৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এই নদীর উপনদীর সংখ্যা প্রায় ৩০০। এগুলির মধ্যে ৩৪টি নৌকা - চলাচলের উপযুক্ত। এর কয়েকটি উপনদীর নাম হল—ইভা, দ্রাভা, সাভা, টিজ্জা। ডানিয়ুব অববাহিকার শতকরা ৫৬ ভাগ জল আসে দক্ষিণ তীরের উপনদীগুলি থেকে। এই উপনদীগুলির মধ্যে কোনও কোনওটি ডানিয়ুবকে আল্পস পর্বতের এবং অন্যান্য পর্বতের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এই নদীগুলি এই সব পর্বতের জল বহন করে ডানিয়ুব নদীর সম্পূর্ণ গতিপথের শতকরা ৬৬ ভাগ জলের জোগান দেয়।

ডানিয়ুব নদী কৃষ্ণসাগরে মেশার ৫০ মাইল আগে বদ্বীপের সৃষ্টি করেছে। এখানে নদী তিনটি খাতে ভাগ হয়ে গেছে। চিলিয়া শাখাটি নদীর ৬৭ ভাগ, সুলিনা ৯ ভাগ এবং সেন্ট জর্জ ২৪ ভাগ জল বহন করে। সুলিনা শাখাটি ২৩ ফুট গভীর করে খোঁড়ার পরে তার মধ্যে দিয়ে নৌকা চলাচল করে। এই শাখাগুলির মধ্যে অনেক হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে—তার মধ্যে মধ্যে রয়েছে লম্বা সমভূমির টুকরো। এইগুলিকে বলা হয় প্রিনভুরি। এখানে চাষবাস খুব ভাল হয়। কোথাও কোথাও ওক গাছও দেখতে পাওয়া যায়। জলাভূমিতে যেসব গুল্ম জন্মায় সেগুলি দিয়ে কাগজ ও সুতো তৈরি করা হয়। ডানিয়ুব নদীর বদ্বীপের আয়তন ১,৬৬০ বর্গ মাইল। প্রতি বছর এখানে ৮০,০০০,০০০ টন পলিমাটি জমা হয় এবং এই বদ্বীপ সমুদ্রের দিকে প্রতি বছর ৮০ থেকে ১০০ ফুট এগিয়ে যাচ্ছে।

শীতকালে ডানিয়ুব নদীর কোনও কোনও অংশে বরফ জমে যাওয়ার ফলে ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত কোথাও-কোথাও বন্যার সৃষ্টি হয়। বাঁধ তৈরি করার ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ অনেক জায়গায় বদলে গেছে। এই নদীতে নৌকা-চলাচলের যাতে উন্নতি হয় সেজন্যে অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এইগুলি থেকে জলবিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। আগে এই নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত, এখন জল দূষিত হয়ে যাওয়ার জন্যে সব মাছ জলাভূমিতে আশ্রয় নিয়েছে। ডানিয়ুবকে ইউরোপের অন্যান্য নদীর সঙ্গে যুক্ত করে সারা ইউরোপে জলপথ বৃদ্ধি করার অনেক পরিকল্পনা আছে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সদাশিব

আদিকাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ

এর পরে আগামী সংখ্যায়

রোভার্সের রয়

একটু দাঁড়াও!
আরে, রয়!
রয় পাগল!
আরে, এইভাবে কি গুন্ডামি ঠেকানো যায়?

দ্যাখো গুরু, উপদেশ-টুপদেশ দিও না!
তা কেন দেব?

বলছিলুম যে, তোমরাও বাসে উঠে পড়ো!
অ্যাঁ, ক্লাবের বাসে?
বলো কী!

হুররে!
ব্যাপার কী?
প্রচুর সীট রয়েছে!
বাস্ রে!

অটোগ্রাফ না চার!
চায় তো দিয়ে দাও!
মনে রেখো, এরা আমাদেরই সমর্থক!

তা তো বুঝলুম, কিন্তু এতে লাভ কী?
লাভ এই যে, বোঝাপড়াটা বাড়ে...
ওদের জন্যেই তো খেলি!

ওরা আছে বলেই ক্লাবগুলির এত রমরমা! যে-পয়সায় ওরা টিকিট কাটে, সেই পয়সাতেই আমাদের এত বাড়বাড়ন্ত।

ওল্ডফীল্ড স্টেডিয়ামে....
জয় রোভার্স!
গুরু, আজ গোল চাই!
চেষ্টা করব!

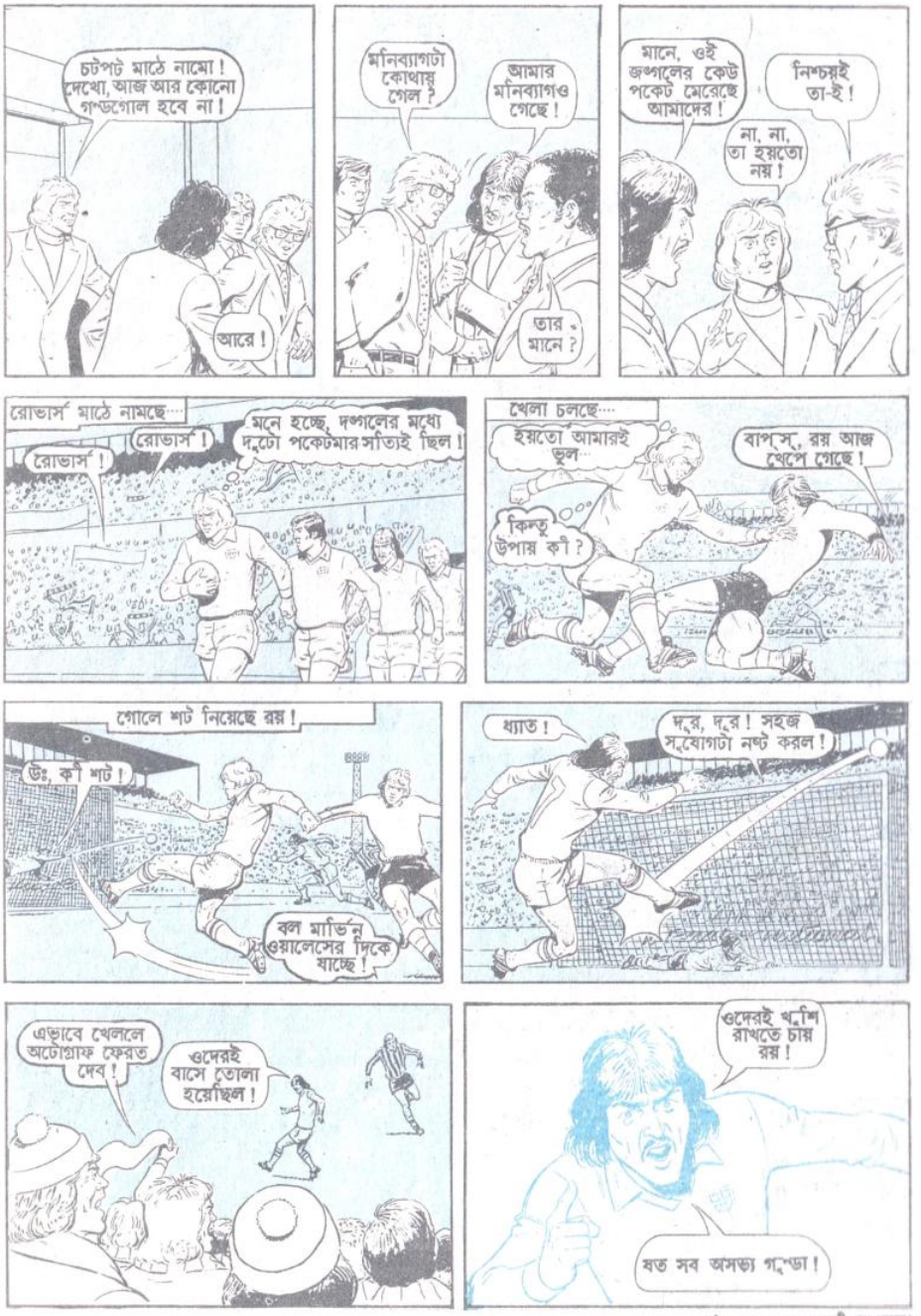

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ওরে বাবা, সেই মমি-ভূত! স্ফটিকের মস্ত বল হাতে নিয়ে আমার ঘরে ঢুকেছিল!
তার মানে সেই একই দুঃস্বপ্ন!
তবু একবার দেখা যাক!
কেউ নেই! অর্থাৎ এটা স্বপ্নই! বুঝলেন?
কুট্টুস অমন করছে কেন?
নিশ্চয় কোনো গন্ধ পেয়েছে!
সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে! তবে কি……
শ্‌শ্‌শ্‌!
পা সামলে!
?
দুম
দড়াম
বাপ্‌স! সর্ষেফুল দেখিয়ে ছাড়ল!
মাথা ফাটেনি তো?
যাক, ফাটেনি!
কিন্তু ভাঙতে পারত!
শব্দ কোরো না! শ্‌শ্‌শ্‌!

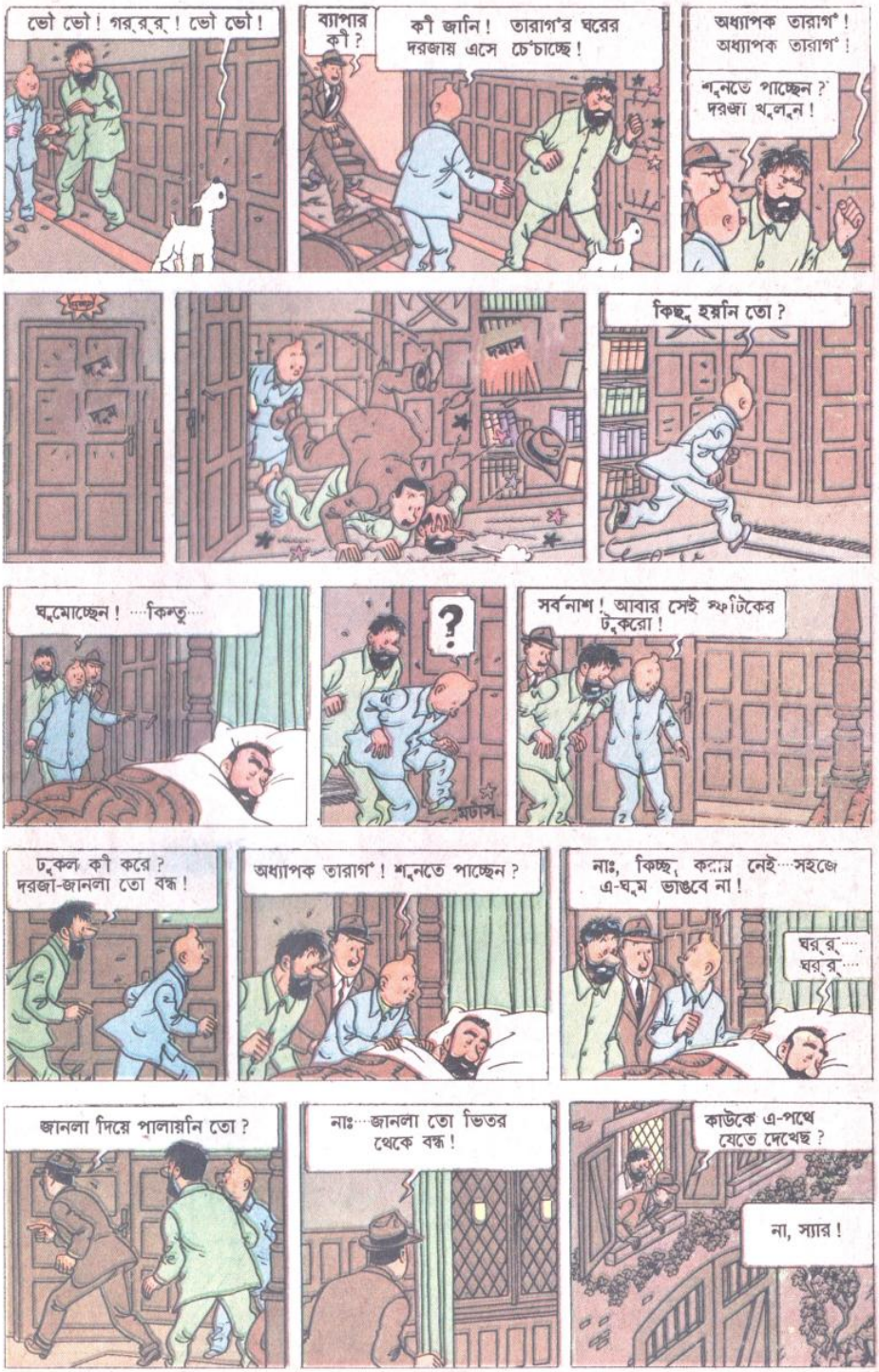

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

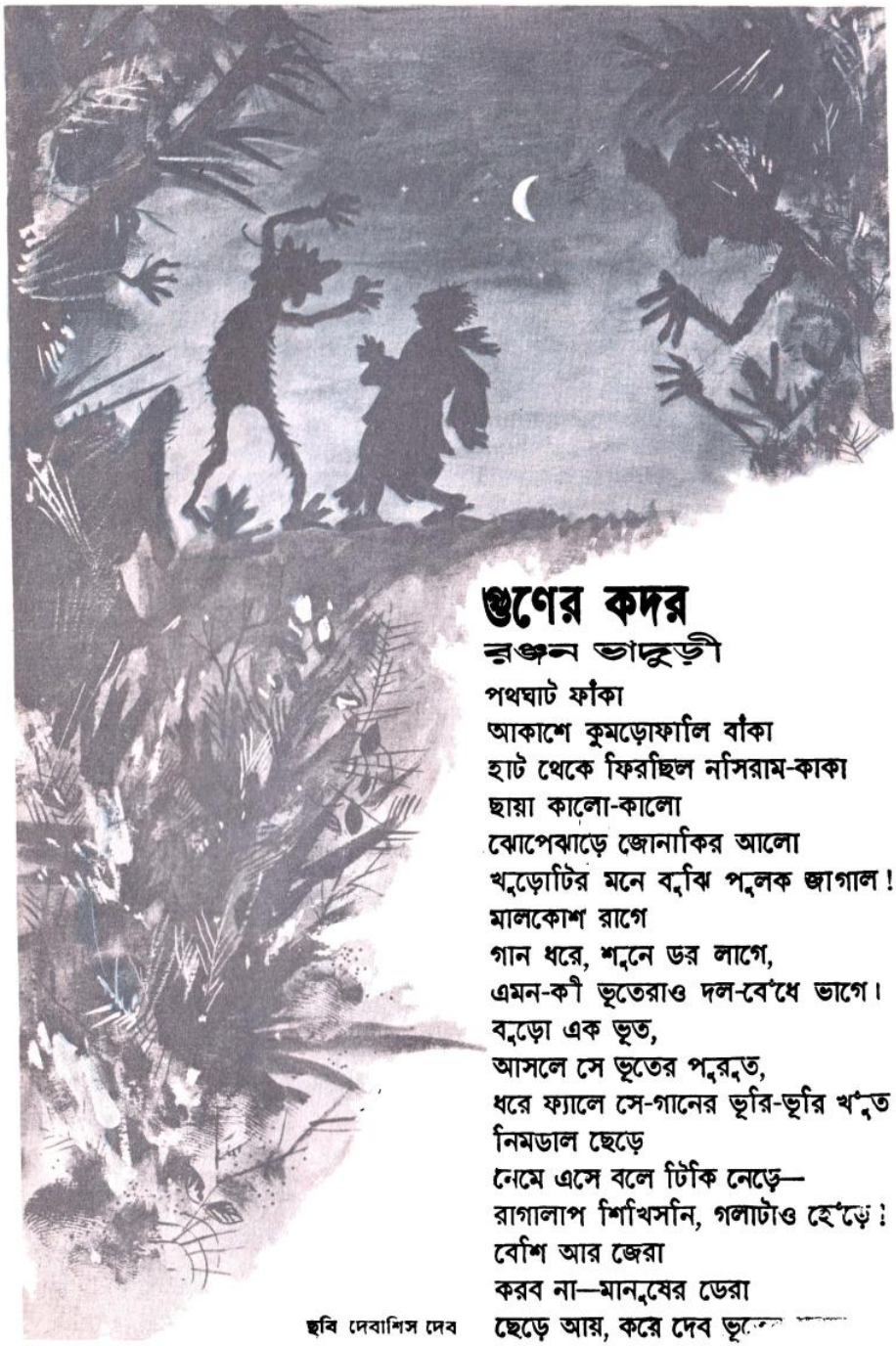

গুণের কদর

রঞ্জন ভাদুড়ী

পথঘাট ফাঁকা
আকাশে কুমড়োফালি বাঁকা
হাট থেকে ফিরছিল নসিরাম-কাকা
ছায়া কালো-কালো
ঝোপেঝাড়ে জোনাকির আলো
খুড়োটির মনে বুঝি পুলক জাগাল !
মালকোশ রাগে
গান ধরে, শুনে ডর লাগে,
এমন-কী ভূতেরাও দল-বেঁধে ভাগে।
বুড়ো এক ভূত,
আসলে সে ভূতের পুরুত,
ধরে ফ্যালে সে-গানের ভূরি-ভূরি খুঁত।
নিমডাল ছেড়ে
নেমে এসে বলে টিকি নেড়ে—
রাগালাপ শিখসনি, গলাটাও হেঁড়ে !
বেশি আর জেরা
করব না—মানুষের ডেরা
ছেড়ে আয়, করে দেব ভূ

ছবি দেবাশিস দেব

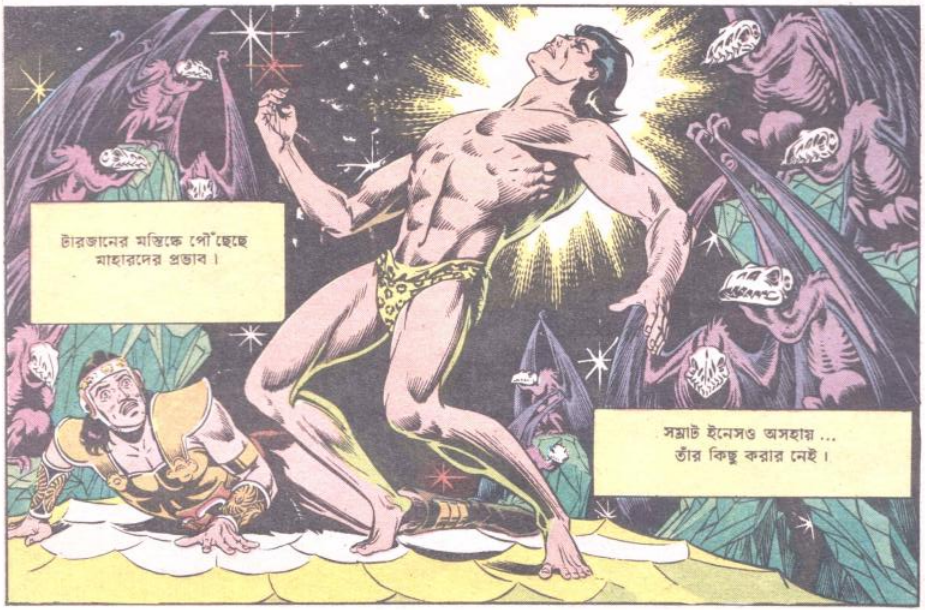

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

কে?

বিমল মিত্র

আগে যা ঘটেছে : জয়রামবাবুর মাতৃহারা ছেলে জ্যোতি পার্কে হারিয়ে গেছে। অনামা ভদ্রলোক চিঠি লিখে জানিয়েছেন, এ-ব্যাপারে যেন পুলিসে খবর দেওয়া না হয়। জ্যোতি তাঁর সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে ওঠে॥ তারপর···

৪

সেদিনও জয়রাম চাটুজ্যে মশাই তাঁর বৈঠকখানায় রোজকার মতো বসে ছিলেন। যাঁরা রোজ আসেন তাঁরাও নিয়ম করে এসেছিলেন।

মল্লিক মশাই একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, —"জ্যোতির কিছু খবর পেলেন?"

জয়রামবাবু যা রোজ বলেন তাই-ই বলেছিলেন, "না"

"আর পুলিস? পুলিস কিছু খবর দেয়নি?"

"না।"

মল্লিক মশাই বলেছিলেন, "বড় আশ্চর্য তো। আজকালকার পুলিস আর আগেকার মতো তাদের ডিউটি করে না? এতদিন হয়ে গেল, একটা খবর তো দেবে তারা।"

জয়রামবাবু বলেছিলেন, "আমি আর কী করব বলুন? সবই ভগবানের ইচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে কার জন্যে সংসার করছি। এ-সংসার করেই বা কী হবে?"

মল্লিক মশাই বলেছিলেন, "ও-সব কথা ভাববেন না। ওতে আপনার শরীর আরো খারাপ হবে।"

ক'দিন ধরেই এই সব কথা আলোচনা হয়। সবাই এসে ওই একই কথা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু কেউ সমস্যার সমাধান করতে পারে না। যে-লোকটি চিঠি লিখেছে সে-ই বা কে? সে কেন জ্যোতিকে নিয়ে চলে গেল? আর যদি নিয়েই গেল তো ও-রকম চিঠিই বা লিখে রেখে গেল কেন? কী তার উদ্দেশ্য?

জয়রামবাবুর নিজের বলতে তো কিছুই আর রইল না। জ্যোতির মা ছিল, সেও তো কবে মারা গেছে। একদিন এই জয়রামবাবুও ছোট ছিলেন। সে-সব দিন কী আনন্দেই তখন তাঁর কেটেছে। জয়রামবাবুর আর-এক ভাই ছিল। সেও একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। সেদিনও জয়রামবাবু খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। সেদিনও তিনি খবরের কাগজে ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। সেদিনও তিনি পুলিসের থানায় খবর দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হয়নি।

মল্লিক মশাই বলেছিলেন, "একজন জ্যোতিষী আছেন। খুব ভাল জ্যোতিষী। তাঁকে একবার হাতটা দেখাবেন?"

জয়রামবাবু বলেছিলেন, "এখন ঠাকুর-দেবতার ওপরও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। তবে যদি ভাল জ্যোতিষী হয় তো আমি যেতে পারি। বলুন কবে যাবেন?"

তা মল্লিক মশাই একদিন জয়রামবাবুকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই জ্যোতিষীর কাছে। জ্যোতিষী মশাই অনেকক্ষণ ধরে জয়রামবাবুর হাতের রেখা দেখলেন।

তারপর বললেন, "আপনার ছেলে বেঁচে আছে।"

জয়রামবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ছেলে কবে ফিরে আসবে? আমি কি বেঁচে থাকতে ছেলেকে দেখতে পাব?"

জ্যোতিষী বললেন, "হ্যাঁ, দেখতে পাবেন।"

"কবে দেখতে পাব?"

"দেরি আছে।"

"কত দেরি?"

"অনেক দেরি।"

জয়রামবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, আমার স্ত্রী মারা গেছে, আমার ভাই নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। আমার একমাত্র শিশু-সন্তান ছিল, সে-ই ছিল আমার একমাত্র সুখ-শান্তি যা-কিছু সব। সে-ই বা হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কেন?"

জ্যোতিষী আরো কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে তাঁর হাতের রেখা দেখলেন। তারপর বললেন, "আপনার লগ্নের তৃতীয় স্থানে রাহু নীচস্থ, তাই এই দুর্যোগ।"

"কিন্তু আমার জীবনে তাহলে কি গৃহ-সুখ নেই?"

জ্যোতিষী বললেন, "আপনার বাল্যকালটা তো খুব সুখেই কেটেছে। তখন তো আপনি

৫ থেকে [illegible] বয়সের ছেলেমেয়েদের দাঁতে সহজেই ক্যাভিটি হয়ে যায়। যদি [illegible] থেকেই দাঁতে ক্যাভিটি ধরতে পড়ে। তাই দাঁত পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্যে আপনার বাচ্চাকে নিয়মিতভাবে দাঁতের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন। [illegible] নিজের হাতে বসে সহজেই দাঁতের ক্ষয় রোধ করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। হ্যাঁ, প্রত্যেকবার খাওয়ার পর কলগেট দিয়ে দাঁত ব্রাশ ক'রে।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে জীবাণু সৃষ্টি হয়। ফলে, মুখে [illegible] যন্ত্রণাদায়ক দাঁতের ক্ষয় শুরু হতে পারে। কলগেটের অপূর্ব সক্রিয় ফেনা দাঁতের ভেতরে গভীরে পৌঁছে বিপজ্জনক খাবারের টুকরো আর জীবাণু দূর ক'রে দেয়। তাই আপনার বাচ্চাকে, প্রতিবার খাওয়ার পর কলগেট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করতে শেখান। বাচ্চারা কলগেট দিয়ে নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করতে ভালওবাসে। কারণ, এতে আছে সতেজ পিপারমিণ্টের স্বাদ।

জীবাণুমুক্ত নির্ম্মল শ্বাস প্রশ্বাস ও ঝকঝকে সাদা দাঁতের জন্যে সারা পৃথিবীতে লোকে সবচাইতে বেশী কেনে কলগেট টুথপেস্ট।

DCG.70 BN

খুব সুখই পেয়েছেন। তখন আপনি যা চেয়েছেন তাই-ই পেয়েছেন। আপনার সুখ দেখে অন্য লোকেরা আপনাকে হিংসে করেছে। তা মানুষের সমস্ত জীবনটা কি একরকম যায়। সুখের পরেই তো দুঃখ আসে। আবার দুঃখের পরেই সুখ। এইটেই তো সংসারের নিয়ম।''

''কিন্তু আর কখনও কি সেই সুখ ফিরে আসবে না?''

জ্যোতিষী বললেন, ''না, মানুষের জীবনটা নদীর মতন। একবার নদী যে গ্রাম বা শহর দিয়ে চলে যায়, সেখানে আর সে ফিরে আসে না। তখন কেবল সে সমুদ্রের মোহনায় গিয়ে মেশবার জন্যে ছুটে চলে। আপনার জীবনও সেই মহাজীবনে গিয়ে মেশবার জন্যে ছুটে চলেছে। নদী সমুদ্রে মিশে শেষ হয় না, সম্পূর্ণ হয়। আপনি যে জীবন নিয়ে জন্মেছিলেন সেই জীবন এখন সম্পূর্ণ হবার দিকে ধেয়ে চলেছে। যেদিন তা হবে আপনি সেদিন চরম সুখ-শান্তি পাবেন।''

এর পর আর বেশি কথা হয়নি। রাস্তায় এসে মল্লিক মশাই জিজ্ঞেস করলেন, ''কেমন মনে হল জ্যোতিষীকে?''

জয়রামবাবু বললেন, ''কী জানি, অত ভারী ভারী কথা, ও-সব তত্ত্বকথা আমি বুঝতে পারলুম না। তবে জ্যোতি যদি কোনও দিন ফিরে আসে তাহলে বুঝব আপনার জ্যোতিষী ঠিক।''

সেদিন বাড়ি ফিরে এসে তিনি তাঁর বসবার ঘরে চুপ করে বসে ছিলেন। একটু বোধহয় তন্দ্রামতন এসেছিল। হঠাৎ গোপালের ডাকে তাঁর তন্দ্রা ভেঙে গেল।

''বাবু—''

তিনি চমকে উঠলেন, ''অ্যাঁ—''

''এই যে খোকাবাবু এসেছে।''

তিনি একেবারে লাফিয়ে উঠেছেন। দেখলেন সামনেই দাঁড়িয়ে আছে জ্যোতিষ্ক, তাঁর জ্যোতি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিকে জড়িয়ে ধরেছেন।

''কোথায় ছিলি তুই জ্যোতি? এ ক'দিন কোথায় ছিলি?''

জ্যোতি হাসল। বললে, ''আমি অনেক দূরে গিয়েছিলুম বাবা।''

''অনেক দূরে মানে?''

''অনেক দূরে। একেবারে সেই আকাশে।''

''দূর বোকা, আকাশে কখনও যাওয়া যায়? আসলে কী হয়েছিল বল্ তো? কে তোকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল? আমি যে তোকে কত খুঁজছি এদিকে। থানা-পুলিসে খবর দিয়েছি, তারাও তোকে কেউ খুঁজে বার করতে পারেনি। তুই কত রোগা হয়ে গিয়েছিস। কিছু খেতে পাসনি বুঝি?''

''হ্যাঁ, আমি অনেক পেট ভরে খেয়েছি।''

''কী খেয়েছিস?''

''চপ খেয়েছি, কাটলেট খেয়েছি...''

''চপ-কাটলেট খেয়েছিস? পয়সা কোথায় পেলি? তোর কাছে তো একটাও পয়সা ছিল না! চপ-কাটলেট কে খাওয়ালে?''

''সে একটা লোক।''

''কে সে লোক? সে-লোকটা তোকে খাওয়ালে কেন?''

''সে-লোকটা কিন্তু খুব ভাল বাবা। আমাকে বললে আমাকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে। তুমি তো আমাকে অনেক দূরে নিয়ে যাও না। আমাকে অনেক দূরে তুমি যেতেও দাও না। আমি কতবার তোমাকে বলেছি আমাকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে। সে আমাকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়েছিল।''

''এখন কী করে এলি? কে তোকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল?''

''সেই লোকটা।''

''কে সেই লোকটা? সে তোকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে বললে আর তুইও তার সঙ্গে চলে গেলি? একবার আমার কথাও ভাবলি না? আমি যে তোর জন্যে ভেবে ভেবে মরছি। আমি যে তোর জন্যে পুলিসে খবর দিয়েছি।''

জ্যোতি বললে, ''বা রে, সে-লোকটা যে বললে আমার বাবাকে সে চিঠি লিখে খবর দিয়ে দেবে। তাহলে তুমি আর ভাববে না! সে লোকটা তো তোমাকে চিঠি লিখে সব জানিয়ে দিয়েছিল, আমি দেখেছি—''

জয়রামবাবু জ্যোতিকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলেন। তারপর ডাকলেন, ''কৈলাস, ভৈরব, ওরে গোপাল, তোরা সব গেলি কোথায়?''

কেউ জবাব দিলে না তাঁর কথায়। তিনি আবার চিৎকার করে ডাকলেন, ''ওরে ভৈরব—''

তাঁর নিজের গলার শব্দে তাঁর নিজেরই ঘুম ভেঙে গেল। তিনি চারদিকে চেয়ে দেখলেন। সব অন্ধকার। কেউ কোথাও নেই। তিনি একলা তাঁর বিছানার ওপর শুয়ে আছেন। তবে কি এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন

দেখছিলেন? তিনি বিছানা থেকে উঠলেন। উঠে আলো জ্বালালেন। আলো জ্বেলে দেখলেন ঘড়িতে রাত তিনটে বেজেছে। তাঁর চোখ দুটো জলে ভরে এল। তিনি আলো নিভিয়ে আবার বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দিলেন।

ট্রেনটা তখন হু-হু করে দৌড়ে চলেছে। অন্ধকারের মধ্যে আর কিছু স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না। কখনও কখনও অন্ধকারে একটা আলোর বিন্দু খুব তাড়াতাড়ি উল্টোদিকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে একটা স্টেশন এসে থেমে যাচ্ছে। তখন প্লাটফরমের ওপর কয়েকটা লোক দেখা যায়। গাড়ির জানালার কাছে এসে একজন চিৎকার করে উঠল, "চায় গর্ম—চায় গর্ম—"

জ্যোতি কিছু বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে, "লোকটা কী বলছে কাকাবাবু?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "গরম চা—"

"গরম চা বলছে কেন?"

"গরম চা খাবার জিনিস একরকম।"

"আমি গরম চা খাব।"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "না, ছোটদের গরম চা খেতে নেই।"

"কেন, খেলে কী দোষ হয়?"

"ছোট ছেলেদের চা খেলে পেট গরম হয়।"

জ্যোতি বলল, "তুমি তো বড়, তুমি চা খাচ্ছ না কেন?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "আমি চা খাই না।"

"কেন চা খাও না?"

"ও খেলে নেশা হয়।"

"নেশা কী কাকাবাবু?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "নেশা করা কারোর উচিত নয়। নেশা হল বদ অভ্যেস। নেশা করার অভ্যেস করলে মানুষের শরীর মন সব খারাপ হয়ে যায়!"

"কেন, কেন শরীর মন খারাপ হয়?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "তোকে নিয়ে তো মহা মুশকিলে পড়া গেল।"

গাড়ির অন্য দু'জন ভদ্রলোক জ্যোতির কথা শুনে খুব হাসছিলেন। বললেন, "আপনার ভাইপোটির দেখছি খুব বুদ্ধি। সব জিনিস ওর জানা চাই।"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "ও যা দেখবে তাই

বিদেশের অনেক রকম ছবি দেখ তোমরা।

বড় বড় আকাশ ছোঁওয়া বাড়ি। বিশাল বিশাল রাস্তাঘাট। অগুণতি ফ্লাইওভার, পার্ক, লেক কত কি।

এসবের পাশে আমাদের কলকাতা নিতান্তই গরীব শহর।

গরীব হলেও কলকাতার কিন্তু একটা নিজস্ব প্রাণ আছে। এখানকার প্রত্যেকটা লোকের পরিচয় হ'ল যে, সে কলকাতাবাসী। প্রত্যেকের প্রাণে আরেকজন কলকাতাবাসীর জন্য আছে দরদ, আছে একধরণের অনুভূতি। আছে মানবিকতা বোধ।

বিদেশের বড় বড় শহর যদি তাদের প্রাচুর্যের গর্ব করতে পারে, তবে আমরাও গর্ব করতে পারি কলকাতাবাসীর এই দরদী আর অনুভূতিপ্রবণ মনের জন্য। মনের চেয়ে সুন্দর আর কি হতে পারে?

বিশ্বের অন্য সব শহরের তুলনায় এখানকার অপরাধ সংখ্যা যে এত কম, সেটাই এর অকাট্য প্রমাণ।

পৃথিবীর অন্য সব বড় শহরের অপরাধ সংখ্যার হিসেব দেখলে আমাদের, অর্থাৎ কলকাতাবাসীর চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ, ৩-এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

নিয়েই একেবারে পাগল করে দেবে মানুষকে। যতক্ষণ না জবাব পাবে ততক্ষণ আর ছাড়ান-ছোড়ন নেই।"

একজন ভদ্রলোক বললেন, "ভাল, খুব ভাল। দেখবেন বড় হলে ও একজন সায়ান্টিস্ট হবে, মানে বৈজ্ঞানিক হবে।"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "তা কি বলা যায়? ছোট বয়েসে ও-রকম সব ছেলেই কৌতূহলী হয়।"

অন্য ভদ্রলোক বললেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী বলেছেন জানেন? তিনি বলে গেছেন, যে ছেলে ছোটবেলায় বেশি ভাবে সে বড় হয়ে দার্শনিক হয়, আর যারা ছোটবেলায় সব জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারা বড় হলে বৈজ্ঞানিক হয়।"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "বড় হয়ে এ যা হবে তা হবে, কিন্তু এখন তো আমাদের জ্বালিয়ে খায়।"

ইঞ্জিনটা এবার জোরে হুইসল বাজিয়ে দিল।

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "ওই শোনো, ইঞ্জিনের হুইসল বেজে উঠল। এবার আবার ট্রেনটা চলতে আরম্ভ করবে।"

আর সত্যিই তাই হল। গার্ডসাহেবের বাঁশির শব্দ হল।

"সব সময় বাঁশি বাজায় কেন গার্ডসাহেব?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "বাজায় এই জন্যে যে, ইঞ্জিনে যে ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে তাকে জানিয়ে দেওয়া হল যে এবার তুমি গাড়ি ছাড়ো। আর যে-সব লোক গাড়ি থেকে প্লাটফরমে নেমেছিল তারাও এবার গাড়িতে উঠে বসবে।"

জ্যোতি কথাগুলো মন দিয়ে শুনে বললে, "এর পর আবার কখন গাড়ি থামবে?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "বাঁধা সময় আছে, বাঁধা জায়গা আছে তার। ড্রাইভার জানে কোথায় কোন্ স্টেশনে গাড়ি থামাতে হবে।"

জ্যোতি জিজ্ঞেস করলে, "কেন গাড়ি থামায় ড্রাইভার?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "না থামালে লোক নামবে কী করে? যেখানে লোক নামবে সেখানে গাড়ি থামাতে হবে। আবার অনেক লোক সেখান থেকে ট্রেনে উঠবে।"

"সবাই কোথায় যাবে?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "যে যেখানকার টিকিট কেটেছে সেখানে যাবে।"

"কেউ অনেক দূরে যাবে না?"

"হ্যাঁ, অনেকে অনেক দূরে যাবে।"

জ্যোতি আবার জিজ্ঞেস করলে, "তুমি আকাশের টিকিট কেটেছ তো?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "হ্যাঁ।"

"আকাশে গিয়ে বুঝি ট্রেনটা থেমে যাবে?"

"হ্যাঁ।"

"আকাশে পৌঁছে আমি কিন্তু চাঁদের গায়ে হাত দেব।"

"হ্যাঁ, দিও।"

বলে চন্দ্রভানুবাবু আবার বললেন, "এইবার তোমার ঘুম পেয়েছে, তুমি ঘুমোও, আমি বিছানা পেতে দিই।"

জ্যোতি বললে, "আমি ঘুমোব না।"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "ঘুমোবে না কি সমস্ত রাত তুমি জেগে থাকবে?"

"হ্যাঁ।"

"আমরা কামরার আলো নিভিয়ে দেব যে। তোমার জন্যে কি ওই ভদ্রলোকরাও জেগে থাকবেন?"

"তুমি আলো নিভিয়ে দাও না। তুমিও ঘুমিয়ে পড়ো। আমি জেগে থাকব।"

"সমস্ত রাত জেগে থাকবে?"

"হ্যাঁ। যখন আকাশে গিয়ে ট্রেনটা পৌঁছোবে তখন আমি তোমার ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে দেব।"

অন্য দুজন ভদ্রলোক তখন শোবার বন্দোবস্ত করছিলেন। তাঁরা বললেন, "না না খোকা, এখন রাত হয়ে গেছে। এখন ঘুমোতে হয়। ঘুমিয়ে পড়ো। এ ট্রেন সারা রাত চলবে। আকাশ আসতে এখন অনেক দেরি।"

জ্যোতির ইচ্ছে ছিল না ঘুমোতে। কিন্তু ঘুমে তার চোখ দু'টো বুজে আসছিল। সে বেঞ্চিটার ওপর শুয়ে পড়ল। চন্দ্রভানুবাবু কামরার আলো নিভিয়ে দিয়ে নিজেও শুয়ে পড়লেন।

অন্ধকারের মধ্যে ট্রেনটা হু-হু করে ছুটে চলতে লাগল। কখন কোন্ স্টেশনে এসে ট্রেন থামল, কোন্ স্টেশনে ট্রেন থেকে কত লোক নামল উঠল কারোর আর খেয়াল রইল না। জ্যোতি তখন অঘোর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছে।

জ্যোতি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগল সে আকাশে গিয়ে পৌঁছেছে। চারদিকে শুধু নীল আর নীল। নীলের যেন সমারোহ চারদিকে। এত নীল সে একসঙ্গে আগে কখনও দেখেনি। তার চোখ জুড়িয়ে গেল সমস্ত দেখে। সে সেই নীলের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ যেন রাস্তায় কীসের ওপর হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল।

হঠাৎ চারদিক থেকে একটা হৈ-চৈ হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। ট্রেনটা ভীষণ দুলে উঠল। ওপরের বেঞ্চিতে চন্দ্রভানুবাবু শুয়ে ছিলেন, তিনি ছিটকে নীচের কামরার মেঝের ওপর পড়ে গেলেন। পাশের কামরা থেকে কারা যেন আর্তনাদ করে উঠল। আর তারপর চারদিক থেকে হুড়মুড় করে শব্দ করে ট্রেনটা উল্টে-পাল্টে তালগোল পাকিয়ে গেল।

চন্দ্রভানুবাবুর তখনও বোধহয় একটু জ্ঞান ছিল, তিনি চিৎকার করে ডাকলেন, "জ্যোতি—"

কারো সাড়া পেলেন না তিনি। তারপর যেন এক কাঠের আস্ত একটা খন্ড তাঁর মাথায় এসে পড়ল। তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সেই জনমানবহীন প্রান্তরে ট্রেনটা লাইন ছেড়ে একেবারে পাশের ধান-খেতে গিয়ে উল্টো হয়ে পড়ল। ড্রাইভার ইঞ্জিন থেকে লাফিয়ে পড়তে গিয়ে পা ভেঙে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। কিন্তু কে শুনবে কার চিৎকার? সবাই-ই যন্ত্রণায় ছটফট করছে। বেশির ভাগ লোকই অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। সেই ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে শুধু ঝিঁঝিঁপোকার ডাক অবস্থাটাকে আরো ভয়াবহ করে তুলল। গার্ড-সাহেব অতি কষ্টে কোনও রকমে বেঁচে গিয়েছিল। সে লাইন ধরে ছুটতে লাগল পরের স্টেশনে দুর্ঘটনার খবরটা জানাবার জন্যে।

(ক্রমশ)

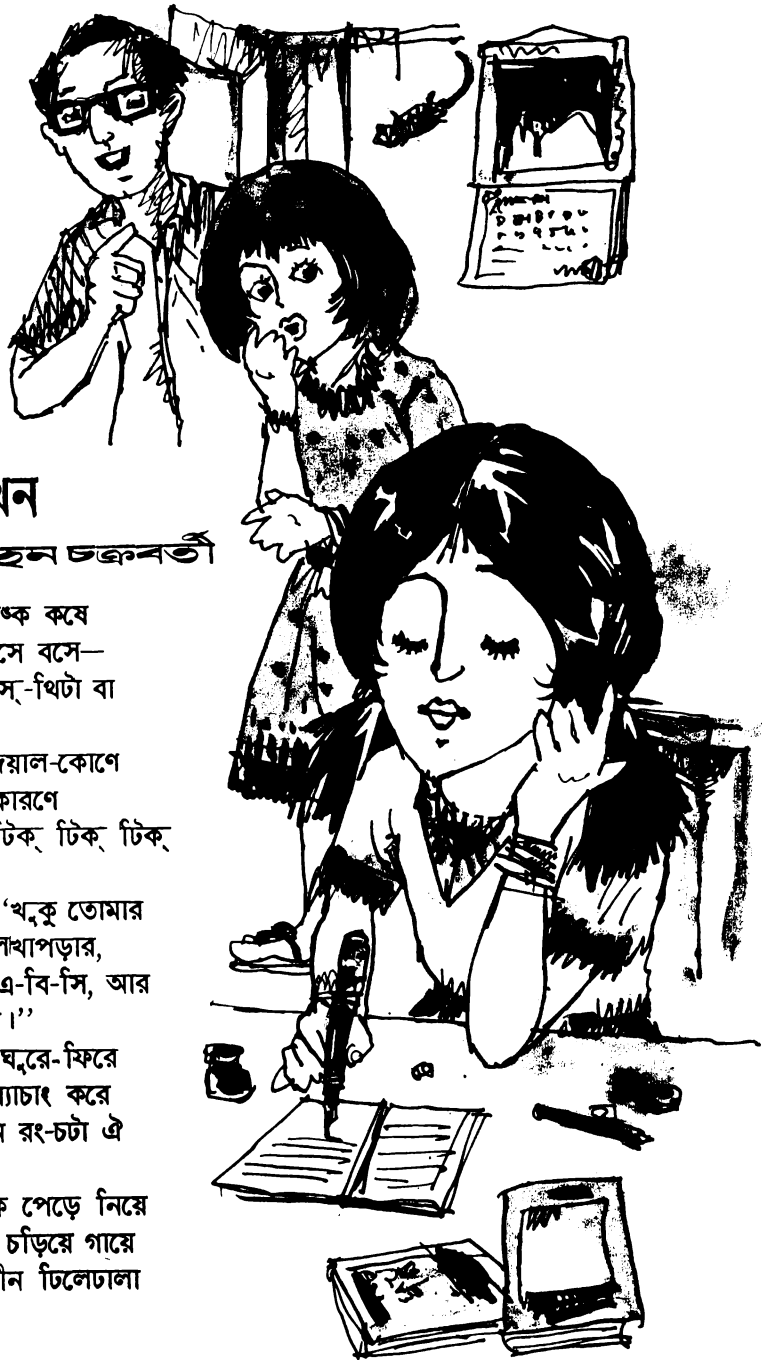

দিদি যখন

সতীমোহন চক্রবর্তী

দিদি যখন অঙ্ক কষে
খুকু ভাবে বসে বসে—
কাকে বলে কস্-থিটা বা
সাইন-থিটা।
এমন সময় দেয়াল-কোণে
নিতান্তই অকারণে
উঠল ডেকে টিক্ টিক্ টিক্
টিক-টিকিটা।
বাবা বলেন, "খুকু তোমার
সবে শুরু লেখাপড়ার,
অ-আ-ক-খ, এ-বি-সি, আর
আল্ফা-বিটা।"
এই না বলে ঘুরে-ফিরে
বাবা হঠাৎ ঘ্যাচাং করে
টেনে খোলেন রং-চটা ঐ
আলমারিটা।
হ্যাঙার থেকে পেড়ে নিয়ে
বাবা বেরোন চড়িয়ে গায়ে
বোতাম-বিহীন ঢিলেঢালা
পাঞ্জাবিটা।

ছবি দেবাশিস দেব

শব্দ-সন্ধান

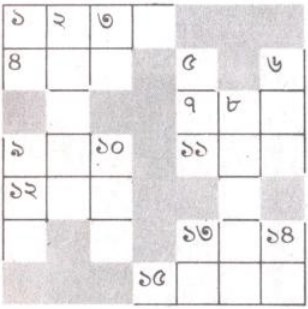

সংকেত : পাশাপাশি : (১) মিষ্টি খাবার। (৪) দূরত্বের মাপ। (৭) তাসের পরিচয়। (৯) জাহাজে থাকে। (১১) তৈলবীজ। (১২) ঘোড়া। (১৩) নিঃস্ব। (১৫) শিশির।

উপর-নীচ : (১) জনৈক কালীসাধক। (২) বিখ্যাত ফরাসি বৈজ্ঞানিক। (৩) শুধু গাছ নয়, অঙ্গবাসও বটে। (৫) বহুবীজ ফল। (৬) লোভনীয় ফল। (৮) বাণভট্ট কার জীবনী লিখেছিলেন? (৯) যাঁর বাড়িতে আবদার চলে। (১০) শুভ সময়। (১৩) মুখে হাঁটে—হাঁটা মানেই কথা বলা। (১৪) উলটে নিলে অন্তঃকরণ।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

পি	স্ত	ল		জ	লৌ	কা
পু	ব		ডা		হ	বু
ল		রা	হু	ল		ল
	উ		ক		খ	
ব	লা	কা		ত	ব	লা
রু	র		গি		র	ব
ণ		অ	রি	ত্র		ণ্য

ধাঁধা

"তুই ভগ্নাংশ জানিস?" ঘরে ঢুকতেই ছোট্‌কা প্রশ্ন করল।

"কেন জানব না!" আমি বেশ অবাক হয়েই জবাব দিই। আমি কি তেমন ছোট, নাকি অঙ্কে কাঁচা? ছোট্‌কা কী ভাবে আমায়!

ছোট্‌কা অবশ্য আমার অবাক হওয়াকে আমল দেয়নি। কেননা, পাল্টা প্রশ্ন করল তক্ষুনি, "বল তো ⅔—এই ভগ্নাংশের কোন্‌টা হর আর কোন্‌টা লব?"

আমাদের অঙ্কের মাস্টারমশাই খুব সোজা করেই এই ব্যাপারটা শিখিয়ে দিয়েছেন আমাদের। তিনি বলেছিলেন, 'লহ' শব্দটা মনে রাখতে। আগে ল, পরে হ। তার মানে ওপরে লব, নীচে হর। আমি ছোট্‌কাকে তাই সঙ্গে সঙ্গেই বললাম—"২ হল লব, ৩ হল হর।"

"চমৎকার!" ছোট্‌কা ছোট্ট করে জবাব দিল। তারপর বলল, "আমি একটা মজার জিনিস লক্ষ করছিলাম। ধর, ⅔ এই ভগ্নাংশের হর হল ৩। এখন এই তিন অঙ্ক যদি লবের সঙ্গে যোগ করি এবং হরের সঙ্গেও যোগ করি, তাহলে ভগ্নাংশটা দ্বিগুণ হয়ে যায়।"

"দ্বিগুণ হয়ে যায়।" আমাকে একটু ভাবতে হল। তার মানে হয় ২+৩=৪, নীচে ৩+৩=৬। ৪/৬, মানে ⅔। তাই তো!

ছোট্‌কা ধরে ফেলেছে যে, অঙ্কটা আমি মনে মনে করছি। তাই কিছুটা সময় দিল। তারপর বলল, "বুঝলি তো। এবার তোকে এই নিয়েই ধাঁধা দেব। লিখে নে।"

আমি লিখে ফেললাম।

প্রথম ধাঁধা ॥ এমন একটা ভগ্নাংশ বার করো, যার হরে যে অঙ্ক, তা যদি লবে এবং হরে যোগ করা যায়, তাহলে ভগ্নাংশটা তিন গুণ হয়ে যাবে। ওইরকমভাবেই আরেকটি ভগ্নাংশ বার করো, যা চতুর্গুণ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ একটা ব্যাট আর বল দেড় টাকায় কিনেছি। ব্যাটের দাম বলের থেকে পাক্কা এক টাকা বেশি। কোন্‌টা কত টাকায় কিনেছি?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ একটি ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্কুলে যাচ্ছে।

প্যাচপেচে কাদা রাস্তায়। দু পা এগোয় তো তিন পা পিছোয়। কী করে স্কুলে পৌঁছবে ছেলেটি? চটপট বলো।

চতুর্থ ধাঁধা ॥ "গন্ডালিকাপ্রবাহ" না "গন্ডলিকাপ্রবাহ" — কোন্‌টা ঠিক?

গতবারের উত্তর ॥ ১। ১৫ মাইল। গাড়ির গড় গতি ৩০ মাইল ঘন্টায়। ২। ৩ টাকা ছিল। ৩। ৭৮ বন্ধনীর দু পাশে যে যে সংখ্যা তা যোগ করে তিন গুণ করলে বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা পাওয়া যাবে। ৪। পরবর্তী সংখ্যা ৩৪ (১১ করে বাড়ছে)।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল ফ্লাস্কের মুখের ছবি   ফোটো তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ কোন্ নদীর কাছে গিয়ে কথা শোনাতে হয়?
উঃ শোন নদী।

প্রঃ জিরাফের গলাটা অত লম্বা কেন?
উঃ ধড় থেকে মুণ্ডুটা যে জিরাফের অনেক দূরে।

প্রঃ কোন্ অঙ্ক মাদুরে বসে কষতে হয়?
উঃ পাটিগণিত।

প্রঃ আমাদের পাড়ার লণ্ড্রিতে কাপড় দিতে গেলে লণ্ড্রির ছেলেটা একটা ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল টীমের নাম করে, কোন্ টীম বলো তো?
উঃ আর্জেন্টিনা। ছেলেটা জিজ্ঞেস করে, আর্জেন্ট না অর্ডিনারি?

প্রঃ দফায় দফায় কোথায় যেতে হয়?
উঃ গয়ায়। গেলেই দফা গয়া।

প্রঃ কার বাড়ির রাস্তা উঁচু-নিচু?
উঃ বন্ধুর পথ।

সুসেন

মজার খেলা

এ-খেলাটাও খেলা যায় বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগত এলে। জন্মদিনে পার্টিতে, উৎসবে।

হারমনিয়াম ভাল বাজায় বা বাঁশি বাজায়, অথবা মাউথ অর্গান বাজায় অর্থাৎ যে-কোনো বাজনা ভালরকম বাজাতে পারে এমন একজনকে আগে থেকে ঠিক করে রাখো। তার সঙ্গে কথা বলে দশটা খুব পরিচিত গান আগে থেকে বেছে নাও। কোন্টার পর কোন্টা সেটাও আগেভাগে ঠিক করে রেখো।

এবার অনেকগুলো কাগজে ওপর থেকে নীচে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যা বসিয়ে রাখো। অতিথিদের মধ্যে যাঁরা এই খেলাটায় অংশ নেবেন, খেলার শুরুতে তাঁদের হাতে এই সংখ্যা-লেখা কাগজ দিয়ে দাও। প্রত্যেকের কাছে

থাকবে একটা কলম অথবা পেন্সিল। কিন্তু লেখা শুরু হবে পরে, যখন বলবে—তখন।

আগে থেকে ঠিক-করা গানগুলোর সুর একটু করে বাজিয়েই থেমে যাবে বাজনা। পর পর দশটা গানের সুর বাজবে। দশটা গান শেষ হবার পর অতিথিদের বলো, হাতের কাগজে পর-পর দশটা গানের কথা যেন লিখে ফেলেন তাঁরা।

যাঁর উত্তর সব দিক থেকে নির্ভুল হবে তিনিই জিতবেন। পুরো গানের কথা কিন্তু লিখতে বলো না, জায়গায় কুলোবে না, ঝামেলাও বেশি। শুধু প্রথম লাইনটি লিখলেই চলবে।

খুব জমাটো খেলা এটা। খেলেই দেখো না, কী মজা হয়!

মজারু

হাসিখুশি

নতুন কাজের লোককে জহুরের মা বললেন, "খুব ভাল করে ঘর মুছবে।"

কাজের মেয়েটি হঠাৎ বলল, "মা, খুব ভাল করে মুছতে বলবেন না।"

জহুরের মা অবাক হয়ে বললেন, "সে কী, কেন?"

মেয়েটি বলল, "আর বলবেন না মা, এর আগের বাড়িতে মেঝে এমন তেলতেলে করে মুছেছিলাম যে সে বাড়ির গিন্নি সেই মেঝেতে পা পিছলে পড়ে কোমর ভেঙে আজ তিন মাস হাসপাতালে।"

চিত্রপ্রদর্শনীতে গেছেন এক বিখ্যাত ডাক্তার। তিনি ছবিটবি বোঝেন না, বন্ধুর আগ্রহে এসেছেন। একটি ছবির সামনে খুব জটলা, ছবিটির নাম মৃত্যু, একজন মৃত ব্যক্তি খাটে শুয়ে রয়েছে, বেশ করুণ ছবি। ডাক্তারকে তাঁর বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, "কী-রকম দেখছ!" ডাক্তারবাবু একটু ভাল করে ছবিটা দেখে বললেন, "মুখ-চোখে হলদে ভাব দেখছি, এটা জন্ডিসের কেস ছিল।"

ছবি অহিভূষণ মালিক

খেলতে খেলতে

সুনী গোস্বামী

॥ ২৮ ॥

পঙ্কজদার মুখে শুনেছি, সেবার প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের জন্য সর্বভারতীয় খেলোয়াড়দের একটি প্রদর্শনী খেলা হয় কানপুরে। পূর্বাঞ্চল থেকে সে-ম্যাচে খেলতে গিয়েছিলেন পঙ্কজদা এবং লেস্টার কিং। লাঞ্চ টেবিলে সমাগত খেলোয়াড়দের সামনেই বোম্বাইয়ের ফারুক ইঞ্জিনীয়ার হঠাৎ জয়সীমাকে বললেন, "ওয়েল জয়সীমা, তোমরা তো সেমিফাইনাল খেলতে বোম্বাইয়েই আসছ। আমরা প্রভিন্সের বাইরে খেলতে অপছন্দ করি না। কিন্তু সিজনের প্রায় শেষ। এখন বড্ড টায়ার্ড। তোমরা এলেই ভাল হয়।"

কথাটা কানে কটু লাগল লেস্টার কিং ও বাংলার অধিনায়ক পঙ্কজ রায়ের। বাংলা-হায়দরাবাদ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ না-হতেই ফারুক ইঞ্জিনীয়ার কীভাবে ধরে নিলেন যে, হায়দরাবাদই সেমিফাইনালে উঠবে? ক্রিকেটে বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়দের বড় অহঙ্কার।

কিং একটু চটে গিয়ে বললেন, "ফারুক, তুমি কি ভাবছ আমরা কোনো টীমই নই? কিন্তু তুমি যা ভাবছ, ব্যাপারটা অত সোজা হবে না।"

মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে ফারুক বলেছিলেন, "তোমাদের দলে আছে কে?"

"কেন? শ্যামসুন্দর মিত্র আছে, প্রকাশ পোদ্দার আছে, অম্বর রায় আছে। আছি আমি, এবং পঙ্কজ রায়।"

প্রতিটি নাম জোরে জোরে উচ্চারণ করে ফারুক ইঞ্জিনীয়ার নাকি বলেছিলেন, "শ্যামসুন্দর ? টেঁকা শক্ত। প্রকাশ পোদ্দার আর অম্বর রায়? ওদের তো সবে শুরু। তুমি কিছু বল দেবে আর পঙ্কজ রায় কিছুটা আটকাবে। বাকি সব তো ঝরা পাতার মতো ঝরে পড়বে গিলির গোলার মুখে।"

উত্তরে লেস্টার কিং বলেছিলেন, "দ্যাখো ফারুক, যা ভাবছ তা হবে না। আমরাও খেলতে জানি।"

এমন সময়ে লাঞ্চ-টেবিলে প্রচণ্ড এক বোমার শব্দ। সজোরে টেবিল চাপড়ে গিলক্রিস্ট বলে চলেছেন, "শাট আপ। মেরে ফেলব। মাথা ভেঙে দেব। খেলা শেষ হবার আগেই তোমাদের আধখানা টীমকে পাঠাব হাসপাতালে।"

খোলা স্বভাবের ভাল মানুষ কিংয়ের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনিও চিৎকার করে বললেন, "অত তড়পিও না গিলি। বাম্পার-বীমার তোমার একচেটিয়া নয়। আমরাও দিতে জানি। তুমি যতগুলি দেবে গুনে গুনে আমিও দেব ততগুলি।"

ইডেনে খেলার চ্যালেঞ্জ শুরু হয়েছিল সেই কানপুর থেকেই। এবং গিলক্রিস্ট যে বাজে কথা বলেন না তার প্রমাণ দিয়েছিলেন কানপুরেই। ওই প্রদর্শনী ম্যাচে আট বলে ওভারের ব্যবস্থা ছিল। গিলক্রিস্টের প্রথম বলে একজন ফিরে যাবার পর বাকি সাতটি বলের মধ্যে পঙ্কজদার বিরুদ্ধে দিয়েছিলেন দুটি বিশ্রী বাউন্সার এবং তিনটি বীমার। দুটি বীমার ছুঁড়েছিলেন বুক সোজাসুজি, একটি মাথার খুলি তাক করে। মানুষ খুন করার উদ্দেশ্য নিয়ে এমন ভয়ঙ্কর বল কেউ কল্পনা করতে পারে? তাও প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায়? কিন্তু রয় গিলক্রিস্ট নামক বোলারের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তাঁর কথাই হচ্ছে, বাউন্সার ও বীমার যে বে-আইনী বল, ক্রিকেট-আইনের কোথাও তা লেখা নেই, এবং বাউন্সার ও বীমার দেওয়ায় ফাস্ট বোলারের জন্মগত অধিকার আছে। নিজের আত্মজীবনীতে গিলক্রিস্ট ফাস্ট বোলার সম্পর্কে লিখেছেন :

"He is angry and he is hungry. Most of all he is hungry. Then he is angry. And all the time he is in a hurry."

ক্ষুধা ক্রোধ এবং ঝটিকা ফাস্ট বোলারের জীবনসঙ্গী। এবং কেন তিনি ফাস্ট বোলার? যেহেতু তিনি ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুধার্ত।

জীবনের প্রথম রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে নেমে এই ধরনের ফাস্ট বোলারের সম্মুখীন হতে কার না ভয় হয় বলো? আরও ভীত হয়ে পড়েছিলুম এই কারণে যে, হায়দরাবাদের অধিনায়ক জয়সীমা টসে জিতেও আমাদের বাংলা

দলকে প্রথম ব্যাট করতে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ জয়ের বাসনায় জয়সীমা চেয়েছিলেন গিলক্রিস্টের তাজা আগুনে সকালেই বাংলা দলকে ভেজে নিতে।

কিন্তু কঠিন প্রতিজ্ঞা ছিল পঙ্কজদার মুখে। কিছুতেই হারব না, গিলক্রিস্টের বর্বরতার মুখে নত হব না—এই ছিল তাঁর দৃঢ় পণ। তাঁর ওই মনোভাবে আমরাও অনুপ্রাণিত হয়ে খেলেছিলুম।

ওই ম্যাচে পঙ্কজদা দুই ইনিংসে দুটি অসাধারণ সেঞ্চুরি করেছিলেন। আর শ্যামসুন্দর করেছিল ৯৮ রান। আর আমরা অনেকেই চল্লিশের উপরে করেছিলুম। পঙ্কজদার বহু টেস্ট ইনিংস আমি দেখেছি। কিন্তু সংগ্রাম ও শৌর্যের বিচারে ওই দুটি ইনিংসের সঙ্গে আর কোনো ইনিংসের তুলনা করতে পারছি না। বিশেষ করে দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং। মাত্র ৪২ রানে আমাদের চারটি উইকেট পড়ে যাবার পর পঙ্কজদার ইনিংসকে এক কথায় বলব, সংযম ও সময়োপযোগী ব্যাটিংয়ের তুলনাহীন নিদর্শন।

আমরা দুই ইনিংসে করেছিলুম ৩৮৬ ও ২৮০ রান। হায়দরাবাদ করেছিল ৩৬১ ও ১২১। হেরেছিল ১৮৪ রানে। চারদিন চলেছিল ক্রিকেটের এক হিংস্র সংগ্রাম। গিলক্রিস্ট অবশ্যই প্রথম ইনিংসে পেয়েছিলেন ১২৪ রানে পাঁচটি উইকেট। কিন্তু তাঁর বাকি কাজগুলি ক্রিকেটের কদর্য কাহিনীর খণ্ড ইতিহাস। বেপরোয়াভাবে বাম্পার বীমার ছুঁড়েছিলেন ব্যাটসম্যানের দেহ ও মাথা তাক করে। উন্মাদ আক্রোশে বল করে গেছেন। বীভৎস কণ্ঠে এল বি ডবলিউয়ের আবেদন জানিয়েছেন। আম্পায়ার ও খেলোয়াড়দের গালিগালাজ করেছেন বিশ্রী ভাষায়। দর্শকরা প্রতিবাদ জানালে তাঁদের দিকে থুতু ছিটিয়েছেন। একটা ছোট ছেলেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। দর্শকদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ফ্ল্যাগপোস্ট উপড়ে বর্শার মতো ছুঁড়ে মেরেছেন দর্শকদের গ্যালারিতে। একজন ফোটোগ্রাফারের ক্যামেরা ভেঙে দিয়েছেন।

বাম্পার বীমার দিতে লেস্টার কিংও অবশ্য কার্পণ্য করেননি। কিংয়ের বলেই আবদাস আলি বেগের মুখ থেঁতলে গিয়েছিল, যার ফলে মুখে সাত-আটটি সেলাই করতে হয়। একই দেশের দুই ফাস্ট বোলার এমন ক্রিকেট-যুদ্ধে মেতে-

পঙ্কজ রায়

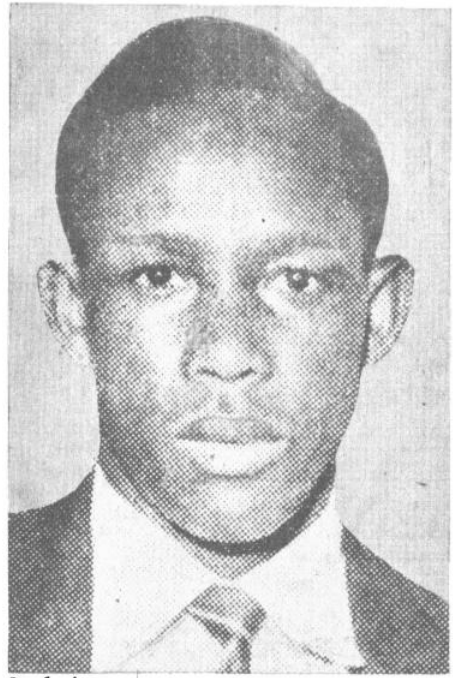

গিলক্রিস্ট

ছিলেন যে, আমাদের মনে হয়েছিল, রাজায় রাজায় যুদ্ধ উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।

ফাস্ট বোলার হিসাবে গিলক্রিস্টের খ্যাতি যেমন আকাশছোঁয়া, তেমন বন্যস্বভাবের জন্য তাঁর অখ্যাতিও বিশ্বজোড়া। হল-গিলক্রিস্ট সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার জুড়ির যুগ্ম নাম। ভারত সফরে এসে টেস্ট খেলা এবং প্রথম শ্রেণীর খেলার বোলিং অ্যাভারেজে ওয়েসলি হলেরও উপরে স্থান ছিল রয় গিলক্রিস্টের। কিন্তু গিলির কয়েক বছরের ক্রিকেট-জীবনের বাণী—হিংসা, নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা ও ধিক্কার। হিংস্র স্বভাবের জন্যই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক গেরি আলেকজাণ্ডার তাঁকে সাসপেণ্ড করেছিলেন।

শাস্তিপ্রাপ্ত ও বেদনাহত গিলক্রিস্ট দেশে না-ফিরে ফিরে গেলেন ইংল্যাণ্ডে সেণ্ট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে মিডলটন ক্লাবে খেলতে। সেখানে প্রথম মরসুমে কী পেলেন? ১৩৭টি উইকেট। তার মধ্যে ৯৭টি বোল্ড এবং পাঁচটি হ্যাটট্রিক। একটি খেলায় চার বলে চারটি এবং আট রানের মধ্যে দশটি উইকেটও ছিল। পরের মরসুমে দেড়শো উইকেট পুরতে যখন তাঁর পাঁচ উইকেট বাকি, তখন ওল্ড হ্যামের সতেরো বছরের একটি বাচ্চা ছেলে তাঁর বলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে দিব্যি খেলতে লাগল। দেড়শো পূর্ণ করার জন্য লীগের ওই শেষ ম্যাচে তাঁর আরো পাঁচটি উইকেট চাই-ই চাই। বাদ সাধল বাচ্চা ছেলেটি। রাগে অন্ধ হয়ে গিলক্রিস্ট দূর থেকে ছুটে এসে একেবারে ক্রিজের মধ্যে ঢুকে মাত্র গজ দশ-বারো দূর থেকে সোজা বল ছুঁড়ে মেরেছিলেন বাচ্চা ছেলেটির বুকে। ছেলেটি একটুও নড়তে পারেনি অত কাছ থেকে 'গোলা' ছোঁড়ার ফলে। ডানা ভাঙা পাখির মতো সে মাঠে লুটিয়ে পড়েছিল। বুকের তিনখানি পাঁজর ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। পরে এর জন্য গিলক্রিস্টকে সাসপেণ্ড করা হয়। নাম হয়ে যায় 'খুনে গিলক্রিস্ট'।

ইডেনে আমাদের ওই খেলায় পঙ্কজদার উপরও অমন একটি বোমা ছোঁড়ার চক্রান্ত করেছিলেন ওই 'মহাবোলার'টি। সাইট স্ক্রীনের কাছ থেকে ওইভাবেই ছুটে আসতে দেখে এবং গিলক্রিস্টের শয়তানি বুদ্ধির আঁচ পেয়ে পঙ্কজদা লেগ আম্পায়ারের দিকে সরে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। গিলক্রিস্ট সত্যিই বল

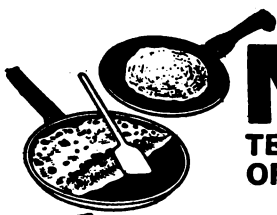

NIRLEP

TEN YEARS IN THE SERVICE
OF INDIAN HOUSE-WIFE

With approved 'ICI' Hard Coat
and 'ISI' Marking

Sole Distributors:
ARYAN TRADERS
Dongre Building, Opp. Ruia College,
Matunga, Bombay 400 019.
Phone: 442176

UMASONS
निर्लेप NIRLEP

Local Dealer :

M|S. AMAR NATH KUNDU & BROS.
14|3, Old China Bazar Street, Calcutta-700001, Phone: 26-7916

হাতে ক্লিজের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। কিন্তু গুলি ছোঁড়েননি, শিকার সরে গিয়েছিল বলে। পঙ্কজদা সরে না গেলে তাঁর জীবনের খেলাই শেষ হয়ে যেতে পারত। ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবার পর গিলক্রিস্ট কী করেছিলেন জানো? আণ্ডারহ্যাণ্ড বল দিয়ে পঙ্কজদাকে অপমান করতে এবং খেলাটিকে প্রহসনে পরিণত করতে চেয়েছিলেন।

এই হচ্ছেন রয় গিলক্রিস্ট। অথচ আত্মকথায় লিখেছেন—

"Cricket is all I ever had in my head. Cricket is my king, my religion, my life."

আমি বলব, মাঠের মধ্যে নিজের নীতিহীন আচরণ ঢাকার চেষ্টায় এটা তাঁর অসত্যভাষণ।

নিজের কথা লিখতে বসে গিলক্রিস্ট সম্পর্কে এই জন্যই এত কথা লিখতে হল যে, জাতীয় ক্রিকেটের প্রথম ম্যাচে ছয় নম্বর ব্যাটসম্যান হয়ে প্রথমেই আমাকে এই মানুষটির মুখোমুখি হতে হয়েছিল এবং তখন মনে হয়েছিল—ছিলুম ভাল, খেলছিলুম বড় বল। সে-খেলায় বিপদ থাকলেও শুধু ছিল ঠ্যাঙের বিপদ। এখানে যে প্রাণের ভয়। পঙ্কজদার বুকের পাশ দিয়ে, মাথার উপর দিয়ে যে লাল গোলাগুলি বেরিয়ে যাচ্ছিল তার একটির ছোঁয়ায় যে কোনো ব্যাটসম্যানের ভবলীলা শেষ হয়ে যেতে পারে। ওই ধরনের বলের জন্যই তো বডি-লাইন সিরিজ নিয়ে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সুসম্পর্কে চিড় ধরেছিল।

জীবনের ওই প্রথম রঞ্জি-ম্যাচে আমার ভূমিকাও নেহাত ক্ষুদ্র ছিল না। প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করার পর পঙ্কজদা ক্লীন বোল্ড হলেন গিলক্রিস্টের দ্বিতীয় নতুন বলের দ্বিতীয় বলে। তখন আমার ব্যাট করার পালা। ভেবে দ্যাখো, জীবনে প্রথম রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে আমি মুখোমুখি হচ্ছি ওই ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত বোলারের। তাঁর হাতে লাল টকটকে নতুন বল। আমার তখন চিন্তা, রান পাই না-পাই প্রাণটা নিয়ে যেন ফিরতে পারি।

আমি মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে ইডেনে একটা গুঞ্জন উঠল। জোরে-জোরে হাততালি বাজতে লাগল। গিলক্রিস্ট তাতে বোধহয় আরও খেপে গিয়ে আমার উল্টো দিকে যে ব্যাট করছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এত হাততালি কেন? ব্যাপার কী?" আমার পার্টনার ব্যাটসম্যান জানাল, "চুনী গোস্বামী খুবই পপুলার একজন ফুটবলার। জাতীয় দলের অধিনায়ক। কিছুদিন আগে জাকর্তা এশিয়ান গেমস থেকে সোনা জিতে ফিরেছে। তাই দর্শকরা ওকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।"

"ওঃ, ফুটবলার? গুলি মারো ফুটবল খেলায়। ক্রিকেটের সঙ্গে ফুটবলের কী সম্পর্ক? ওকে এখনই ফুটবল মাঠে ফিরিয়ে দিচ্ছি!" তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাগুলি বলেছিলেন গিলক্রিস্ট। আমি অবশ্য তখন কথাগুলি শুনিনি। পরে বিকাশের মুখে শুনেছি। আমি তখন আপন প্রাণ বাঁচাতেই চিন্তিত। ভেবেছিলুম প্রথম বলটি হবে বিদ্রী ধরনের বাউন্সার বা বীমার। কিন্তু না, গিলক্রিস্ট ফুটবলারের জন্য করুণাবশেই বোধহয় বাম্পার বীমার ছাড়লেন না। দিলেন একটি ইয়র্কার। বলটি যাচ্ছিল আমার ডান পায়ের ডগার দিকে। আমার ব্যাক লিফট বেশি ছিল না। বলটি ব্লক করার জন্যই আমি ব্যাট পাতলুম। সৌভাগ্যবশত ব্যাট থেকে বল ছিটকে গেল কভারের দিকে। প্রথম বলেই আমি পেলুম তিন রান। ভাবলুম শূন্য করার লজ্জা থেকে অন্তত রেহাই পেলুম। আমি শেষ পর্যন্ত ৪১ রান করেছিলুম এবং হায়দরাবাদের ইনিংসে দুটি শক্ত ক্যাচ ধরেছিলুম। আর পেয়েছিলুম দুটি উইকেট। গিলক্রিস্টের বলে বিপাকে পড়িনি এবং তাঁকে উইকেট দিইনি, সেটাও আমার সন্তুষ্টির কারণ। এল বি ডবলিউ আউট হয়েছিলুম কলিমুল হকের বলে।

হায়দরাবাদের খেলোয়াড়রা হায়দরাবাদে পৌঁছবার আগেই আমি সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলুম। জেনে গিয়েছিলুম সেমিফাইনালেও আমাকে খেলতে হবে বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে। স্টাফ ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করতেই তিনি অভিনন্দন জানালেন। সেই সুযোগে আমি বললুম, "স্যার, আপনার কথা আমি রেখেছি। খেলা শেষ হবার পরই চলে এসেছি। কিন্তু স্যার, আমাকে তো আবার কলকাতা যেতে হবে বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল খেলতে।" প্রিন্সিপ্যাল কোনো দ্বিধা না করেই অনুমতি দিলেন। মাত্র ছয়-সাত ঘণ্টা হায়দরাবাদ থাকার পর আবার আমি প্লেনে চাপলুম কলকাতার উদ্দেশে। (ক্রমশ)

বাঘের বুদ্ধি

শিশির মজুমদার

এক ছিল বাঘ। সে খুব অলস। সারাদিন বনের ভেতর একটা জলাশয়ের ধারে শুয়ে বসে থাকত। শুধু শুধু কি শুয়ে বসে থাকা যায় নাকি! তাই সে মাঝে মাঝে হাই তুলত। হাই তোলার সময় সে তার মুখ দেখত জলাশয়ে। ঝিরঝিরে বাতাসে জলাশয়ে ছোট ছোট ঢেউ উঠত। জল কাঁপত। তাতে হাঁ-করা বাঘের বিকট মুখ অনেক বড় হয়ে যেত। বাঘ তাই চেয়ে চেয়ে দেখত, আর নিজেকে খুব বড় মনে করত।

সন্ধেবেলায় পাখিরা সব যখন গাছে গাছে খুব কিচির-মিচির লাগিয়ে দিত, বাঘ তখন

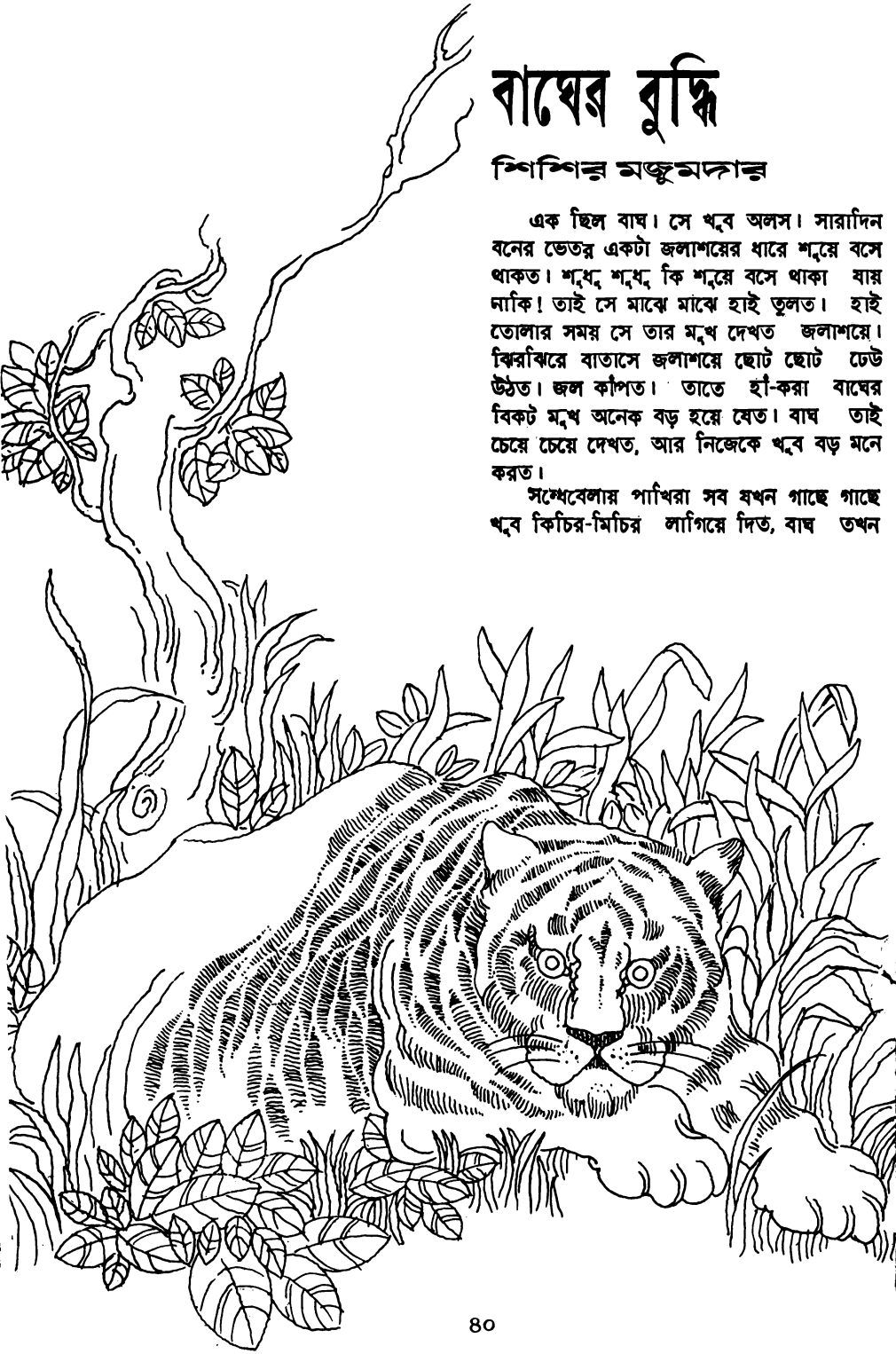

লেজ নাড়াতে নাড়াতে উঠে দাঁড়াত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবত। এক-আধটা শিকারের খোঁজ-টোজ নেওয়া যাক। পেটে কিছু পড়া চাই তো! আজ সারাদিন হাতের কাছে কোনো শিকারই এল না! দুত্তোর। এই ভেবে সে একবার ডাইনে চায়, আরেকবার বাঁয়ে। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে চায়। তারপর একটা চাপা শব্দ করে, উঁম্।

শিকার—সে তো ধরা খুব সোজা। বাঘ ভাবে। সোজা ডান দিকে গেলেই গাঁ পাব। সেখানে থরে থরে সব নধর বাছুর আছে ঘরে ঘরে। ব্যস্, একটা তুলে নিয়েই দেব চোঁচা দৌড়। সিধে এখানে এসে বেশ মৌজ করে খাব।

ভাবতে ভাবতে বাঘের ডান গোঁফটা দু-দুবার নেচে ওঠে।

আচ্ছা ধরা যাক, যদি বাঁ দিকের গাঁ-টায় যাই। সেখানে রয়েছে হৃষ্টপুষ্ট সব চকচকে ছাগল। এ মুখে তার গোটা দুই তুলে আনা কোনো ব্যাপার নয়। কতটুকুই বা পথ! এখানে এসেই বেশ তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া যাবে।

ভাবতে ভাবতে বাঘের মুখটা ফাঁক হয়ে একটু লালা ঝরে পড়ে। বাঘ আবার ভাবতে শুরু করে।

পশ্চিম গাঁ-টা কি খারাপ বাপু। ওদিকে তো শুয়োরের খোঁয়াড়। এক জায়গায় কত কত শুয়োর কিলবিল করছে। আহ্, একখানা তুলে নিলেই তো জম্পেশ খানা।

থাক, আর ভাবাভাবি নেই। একদিকে গেলেই হল। শুধু পুব দিকটা বাঁচিয়ে। ওদিকে বড্ড মানুষের ছানাপোনা। আর ছানাপোনা মানেই ঝামেলা। যদিও একটা মানুষের ছানা মানেই সেরা খানা। কিন্তু তাতে বড্ড হ্যাপা। ওসব ভাবনা এখন থাক। এবার মনটাকে ঠিক-ঠাক গুছিয়ে নিয়ে হাঁটা।

হাঁটতে গিয়ে পা নাড়াতেই বাঘ ভাবে, এত সাত তাড়াতাড়ি কিসের! একটু রাত্তির হোক না! বেশি রাতে শিকার পাওয়া যাবে বেশ।

বাঘের ছিল একটা দোষ। একটু ভাবতে গেলেই তার তেষ্টা পায়। তাই সে ওই জলাশয়ের ধার ছাড়তে পারে না। এতক্ষণ ধরে অনেক ভেবে ফেলায় বাঘের তেষ্টা লাগে ভীষণ। সে তাই সোজা নেমে যায় জলে। পেটভরে তেষ্টা মিটিয়ে গোঁফ চুমড়ে একটা উদ্গার ছাড়ে। সেই উদ্গারের শব্দে বন ওঠে কেঁপে।

তেষ্টা তো মিটল। এবার কী করা।

ভাবাটাবা তো হল। এবার কী করা।

পায়ে পায়ে গাঁয়ের দিকে যাওয়া। তা, আরেকটু রাত্তির হোক। এখন বিশ্রাম করা যাক। বাঘ বুদ্ধি স্থির করে।

বাঘের এতেই বড় আরাম। লেজ গুটিয়ে শুয়ে শুয়ে সে সাত-পাঁচ ভাবতে পারে সারাদিন। ভাবেও তাই। লেজ গুটিয়ে শুয়ে শুয়ে সে চেয়ে চেয়ে দেখে জলাশয়ের চারপাশ। আর ওই দেখতে দেখতে ছোটখাটো শিকার তার সামনে পড়েও যায়। একটু গা নাড়িয়ে গপ্ করে ধরেও ফেলে তাই।

কিন্তু আজ যে কী হল! কোনো শিকার-টিকার—

এখন, একটু বিশ্রাম করা যাক তো! রাত্তির টাত্তির একটু বেশি হোক তো!

ধীরে ধীরে রাতে বাড়ে। বনে পাখিদের কোন সাড়া নেই। শুধু দূর দূর থেকে ভেসে আসে শেয়ালের হুক্কা।

খিদে পায় বাঘের। বিশাল লেজটা দুবার নাড়ে। এই উঠি এই উঠি করে ওঠা আর হয় না।

এই সময় শোনা যায় তার বাঘ-বন্ধুদের আওয়াজ। ওরা যে যার মতো শিকার-টিকার নিয়ে বাড়ি ফিরছে তখন। বাঘ অনেক কষ্টে একটা শব্দ করে ডাকে ওদের— হালুম হো গালুম। অর্থাৎ কী গো ভায়েরা, আজ কী শিকার পেলে?

বন্ধুরা সবাই তাকে চেনে। পারতপক্ষে তারা ওই অলস বাঘের পথ মাড়ায় না। আজ মুখর, তুখোড় বাঘেরা একটু মজা করার জন্যেই ইচ্ছে করে এদিকে পা বাড়িয়েছে।

মুখর বাঘ তার মুখ থেকে একটা ধেড়ে শুয়োর সামনে রেখে বলে, যা দিনকাল পড়েছে দাদা, কী আর শিকার মিলবে বল? কোনো-রকমে পেট বোজানোর ব্যবস্থা আর-কি!

অলস বাঘ লোভা-লোভা চোখে ওই ধেড়ে শুয়োর দেখে। শব্দ করে, উঁম্।

ওই শব্দ শুনে মুখর, তুখোড় বাঘেরা চাপা হাসি হাসে। তারপর, মুখে শিকার নিয়ে সব চলে যায়।

বাঘ তবু শুয়ে থাকে। নিজের প্রতি রাগও হয় তার একবার। পরক্ষণেই দুঃখে ফোঁস করে

একটা নিশ্বাস ফেলে। সেই নিশ্বাসে তার সামনে পড়ে থাকা শুকনো পাতা সব উড়ে যায়।

বাঘ ভাবে, আজ রাত্তির কি শেষ হয়ে গেল! মাথার উপর গাছপাতার ফাঁকে আকাশ দেখে সে রাত আন্দাজ করে।

নাঃ, আজ থাক। কাল সারাদিন শুয়ে শুয়ে ফের ভাবব। ভেবে ভেবে ভাল করে বুদ্ধি খাটাব। তারপর যাব শিকার ধরতে।

পরের দিন সকাল থেকেই খিদেতে তার পেট চনমন করে। খিদের চোটে আলস্য ঝরে পড়ে তার। ঘন ঘন জল খায়। আর ভাবে, আয় রাত্তির, তাড়াতাড়ি আয়।

অবশেষে রাত্তির আসে। এর মধ্যে সে সারাদিন ধরে ভেবেছে। বুদ্ধি খাটিয়ে রেখেছে। এক রাত্তিরে সে উত্তর-দক্ষিণে-পশ্চিমে গাঁ থেকে এমন শিকার জোগাড় করে আনবে যে, তার সব বাঘ-বন্ধুরা তাকে হিংসে করবে। মুখর-তুখোড়রা এসে তাকে তোয়াজ করবে। এক মাস বসে বসে ওই শিকার খাবে সে। একফোঁটাও কারুকে দেবে না।

আজ আর বেশি ভাবাভাবি না।

বাঘ সব আলস্য ঝেড়ে বন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে দখিনে গাঁয়ের পথে। সে ভাবে, দখিনে গাঁয়ে বাছুর আছে থরে থরে। কিন্তু, এ কী! চলতে চলতে তার গা ছম-ছম করে কেন? শরীরটা বেজায় খারাপ খারাপ ঠেকে যে!

বাঘ ভাবে, থাক দখিনে গাঁ। আগে উত্তরে যাওয়া যাক। উত্তুরে গাঁ এই তো খুব কাছে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সে মুখ ঘুরিয়ে উত্তুরে গাঁয়ের পথে চলতে থাকে।

চলতে চলতে তার ভাবনা আসে, যদি ওদিকটায় কোনো ছাগলছানা না পাওয়া যায়! বোকার মতো ওদিকটায় যাওয়ার কোনো মানে হয় না। বাঘ-বন্ধুদের কাছে আগে থেকে খবর-টবর নিলে হত! নাঃ, ওদিকটা যাওয়া পোষাবে না।

চলতে চলতে বাঘ এইসব ভাবে। ভাবতে ভাবতে তার চলা যায় থেমে। তখন তেষ্টা পায় বাঘের। সে কঠিন তেষ্টা। হন্যে হয়ে জলাশয় খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে পায় জলাশয়। প্রাণভরে সে তেষ্টা মেটায়।

এবার আবার হাঁটা। আসলে হাঁটাচলা না করে করে বাঘের হাঁটতে খুব কষ্ট হয়। তার উপর খিদের দাপট।

সে হাঁটতে থাকে পশ্চিমে গাঁয়ের দিকে। একটু আনমনে। হঠাৎ তার মনে হয়, আচ্ছা একটা বুদ্ধি করা যাক্। এইসব ছাগল, গোরু, শুয়োরে নজর দিয়ে কী হবে। এসব বড় ছোট নজর। তার বাঘ-বন্ধুরাও এই ছোট নজরে ছোট ছোট শিকার করে! তাহলে তার সঙ্গে ওদের তফাত কোথায়!

তবে? তবে, বুদ্ধিটা হল এই। একবারে সেরা শিকার। মানুষের বাচ্চা শিকার। বাঘ-বন্ধুদের একেবারে তাক লাগিয়ে দিতে হবে। সে তো আর রোজ রোজ ওদের মতো শিকারে বেরোয় না। ওসব ছোটখাট ব্যাপার তার পোষায় না। শিকারে বেরোলে শিকারের মতো শিকার করতে হয়।

কোন্ দিকের গাঁয়ে যেন। ও, হ্যাঁ, পশ্চিমের গাঁয়। থুড়ি, পশ্চিমের গাঁয়ের পথেই তো সে দাঁড়িয়ে আছে। জবর বুদ্ধিটা তার মাথায় আসতেই দেখি মাথা খারাপের জোগাড়। না, না, এ সময় মাথা খারাপ করলে চলবে না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে চুপিসারে পুবের গাঁয়ের পথে চলতে হবে।

এই ভেবে বাঘ দুবার মাথাটা ঝাঁকিয়ে নেয়। তারপর পা টিপে টিপে পুবের গাঁয়ে মানুষের বাচ্চা মুখে তুলতে এগোয়।

এখন গরমের সময়। দু-পাঁচটা মানুষের বাচ্চা কি আর রাস্তার ধারে বা মাঠের মধ্যে ঘুমুবে না!

বাঘ পথ হাঁটে, খুশিতে ডগমগ হয়ে মাথা নিচু করে। চুপিসারে।

দেখতে দেখতে বাঘ পুবের গাঁয় এসে পড়ে। দেখতে দেখতে বাঘ গাঁয়ের ভেতরে ঢুকে পড়ে, হঠাৎ, একেবারেই হঠাৎ-ই সে শুনতে পায়, কা—কা।

এ কী! বাঘ চোখ তুলে চায়। দেখে দুপাশে সারি সারি ঘুমন্ত সব বাড়ি। অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। সেই ফাঁকে একটা কাক ন্যাড়া গাছের ডালে বসে ডেকে উঠেছে, কা—কা।

বাঘ লেজ তোলে। এক লাফে পেছন ফেরে। এই সময় কে যেন চিৎকার করে ওঠে, বাঘ, বাঘ।

বাস, বাঘের বুদ্ধি গেল ভেস্তে।

ছবি অনুপ রায়

তারা ধরা

এক গ্রামে এক বুড়ি থাকত। সে ভীষণ বোকা। সে একদিন গ্রামের রাজার কাছে গিয়ে বলল, ''রাজামশাই, আমি সেদিন আকাশে তারা ধরতে গিয়ে পড়ে গিয়েছি। কী করে তারা ধরতে হয় আমাকে শিখিয়ে দেবেন?''

রাজামশাই গম্ভীর হয়ে বললেন, ''তারা ধরা খুব কঠিন কাজ। একমাত্র রাজা ছাড়া আর কেউ তারা ধরতে পারে না।''

গার্গী বর্ধন (বয়স ৭)

ছবি এঁকেছে **লোহিনী গুহ** (বয়স ৭)

ছবি এঁকেছে **দেবাশিস সাহা** (বয়স ১২)

লোড-শেডিং

আমার নাম লোড-শেডিং
দেখতে আমায় খুবই কালো,
সব বাড়িতেই আমার বাস
মনটা আমার বেজায় ভাল।

গোপাল দাস (বয়স ১০)

দুটো প্যাঁচা

আমাদের বাড়ির পেছনে একটা বড় জাম গাছ আছে। সেই জায়গাটা বেশ অন্ধকার। একদিন দেখলাম, দুটো সাদা পেঁচা জাম গাছে বসে আছে। ওদের দেখে আমার খুব ভাল লাগল। আমি ওদের দিকে তাকিয়ে যেই না একটু মুখ ভেঙিয়েছি অমনি ওরাও আমাকে মুখ ভেঙাল।

এখন আমাকে দেখলেই ওরা কিচির-কিচির করে। দিনের বেলায় ওরা কোথাও যায় না। সন্ধে হলে ওরা মিন্টুদের বাড়ির ছাতে ঘুরে বেড়ায়। ওরা মাঝেমধ্যে সামনের মাঠের দুটো খুঁটির উপর বসে। তখন ওদের ধরতে গেলেই ওরা উড়ে পালিয়ে যায়।

পম্পি চৌধুরী (বয়স ৯)

ছোটদের যত সেরা বই

ননীগোপাল চক্রবর্তী সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের দুটি চমৎকার বই লিখেছেন ছোটদের জন্য। একটি মেটাবে গল্পের তৃষ্ণা, অন্যটি পূর্ণ করবে জ্ঞানের ভাণ্ডার। রূপকথা, উপকথা, লোকগাথা— সব-কিছুর স্বাদ-মেশানো বই 'চরকাবুড়ী'। আর 'যাদুঘরে চল যাই' হল যাদুঘরের গাইড-বুক। কলকাতা যাদুঘরের কোন্ ঘরে কী রয়েছে তার শৃঙ্খলাবদ্ধ বিবরণ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেছেন তিনি। এ বই হাতে নিয়ে মনে-মনেই যাদুঘর ঘুরে আসা যায়। তাঁর বর্ণনা গল্পের মতো, গল্প ছবির মতো, ছবি কল্পনাকে হার মানানো। দুটি বইতেই প্রচুর ছবি ও ইলাস্ট্রেশন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র শুধু ঘনাদার গল্প শুনিয়েই অবিস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। বলগাহীন কৌতুক-কল্পনার রাজা 'ঘনাদা'—সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তাঁর কোনো জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার। বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়ি আর তার বিচিত্র বাসিন্দারা ঘনাদার সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যের অ্যাল-বামে চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। ঘনাদা যেমন নিত্যনূতন, তাঁর কীর্তি-কাহিনীও তেমনই চিরনতুন। যতবারই পড়া হোক না কেন, কখনও যেন পুরনো হবার নয়। ঘনাদার অভিজ্ঞতা ও কাণ্ড-কারখানার ভাণ্ডারটিও অবশ্য একইরকম-ভাবে অফুরন্ত ও অনিঃশেষ। সমান বর্ণময়, সমান আকর্ষক।

ননীগোপাল চক্রবর্তীর চরকাবুড়ি ৪ যাদুঘরে চল যাই ৬ **ইন্দ্রমিত্রের** বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৬ শরৎ কথামালা ১০ **অমরনাথ রায়ের** দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানী ১০ **আশাপূর্ণা দেবীর** রাজ-কুমারের পোশাকে ৪ **সমরেশ বসুর** মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৬ **অমিতাভ চৌধুরীর** তেপান্তরের মাঠে ৪ **গিরিধারী কুণ্ডুর** টংসা চু ৫ **বিমল মিত্রের** রাজা হওয়ার ঝকমারি ৮ **শিশিরকুমার মজুমদারের** তুফান দরিয়ার পরান মাঝি ৫ **অন্নদাশংকর রায়ের** হৈ রে বাবুই হৈ ৫ **মঞ্জিল সেনের** ডাকাবুকো ৫ **রেবন্ত গোস্বামীর** অরুমিতুদের কথা ৪ **সুবোধ ঘোষের** সেই অদ্ভুত অভ্রখনি ৫ **সত্যজিৎ রায়ের** নানা স্বাদের কাহিনী : এক ডজন গপ্পো ১০ আরো এক ডজন ১০ **ফটিকচাঁদ** ৮ **শিবরাম চক্রবর্তীর** হর্ষবর্ধনের নিত্যনূতন ৪ শিব্রামের বারো আড়ি ৫ দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৬ **পূর্ণানন্দ চট্টো-পাধ্যায়ের** মাধুরীলতার চিঠি ৫ **নারায়ণ চক্রবর্তীর** হলদে সবুজ কুস্ট্যাল ১০ **সমরজিৎ করের** একটি সংকেতের জন্যে ৬ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের** তপন চরিত ৬ **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের** গোসাঁই-বাগানের ভূত ৮ **অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়** সূর্য-পথিক শ্রীঅরবিন্দ ৮ **মতি নন্দী** ক্রিকেটের আইন কানুন ১০ **সুভাষচন্দ্র বসু** তরুণের স্বপ্ন ১০ **সাগরময় ঘোষ** একটি পেরেকের কাহিনী ৪ **মুকুল দত্ত** টেবিল টেনিসের আইনকানুন ৪ **সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার** বিবেকানন্দ চরিত ১৫ **প্রফুল্লকুমার সরকার** শ্রীগৌরাঙ্গ ৬ **ডাঃ সত্যেন্দ্র-নাথ বসু** আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ৬ **শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়,** শরদিন্দু অম্নিবাস ৪র্থ ২০ **সুকুমার রায়ের** সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ১ম ২৫ ২য় ৩০ **জীবজন্তু** ৮ সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

দিদির দুশ্চিন্তা

ব্যাপারটা ঘটেছিল কিছুদিন আগে। ভোরবেলায় দারুণ একটা মজার স্বপ্ন দেখছিলাম। হঠাৎ কান্নার শব্দ কানে আসতেই স্বপ্নের শেষটা আর দেখা হল না। তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে খাট থেকে পড়েই গেলাম।

দিদি কাঁদছিল। ভীষণ অবাক হলাম। আজ দিদির ইংরেজি পরীক্ষা। হঠাৎ কী এমন হল যে, দিদি কাঁদছে! দিদির ঘরের দিকে যেতে যেতে শুনলাম, দিদি কাঁদতে কাঁদতে মাকে ডাকছে—"তাড়াতাড়ি এসো, সর্বনাশ হয়েছে।"

বাবা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বারান্দায় বসেছিলেন, কাপ রেখে তিনি ছুটে এলেন। মা ছুটে এলেন রান্নাঘর থেকে।

একটা চড়াই পাখি জানলা দিয়ে দিদির ঘরে ঢুকে ফ্যানের ব্লেডে ধাক্কা খেয়ে মরে পড়ে আছে। পাখিটা কেন ওর সামনে এসে মরল! এটা নিশ্চয়ই কোনো অমঙ্গলের সূচনা করছে। হয়তো এইজন্যেই ওর পরীক্ষা খারাপ হবে—এইসব ভেবে দিদি খুব কাঁদছিল।

বাবা আর মা ওকে খুব বোঝাচ্ছিলেন। বলছিলেন, ওর মৃত্যুর জন্য তো আমরা কেউ দায়ী নই, তবে কেন পরীক্ষা খারাপ হবে।

আমি বাগান থেকে কিছু ফুল এনে পাখিটার ওপর রাখলাম। তারপর অপমৃত্যুর জন্য গভীর দুঃখপ্রকাশ করে ওর আত্মার শান্তি কামনা করলাম।

রুমনা চক্রবর্তী (বয়স ১০)

কলকাতা

মস্ত শহর কলকাতা
নেই কিছুরই অভাব,
সেথায় গেলে পাওয়া যাবে
সব কিছুরই জবাব।
মনুমেণ্ট, জাদুঘর
সৌধ আছে নানা,
বিনা পয়সায় ঢুকতে গেলে
করবে সবাই মানা।
যেমনি আছে দেখার জিনিস
তেমনি নানান খেলা,
সব মিলিয়ে দেখতে যেন
মনে হয় এক মেলা।

সুকান্ত ঘোষ (বয়স ১২)

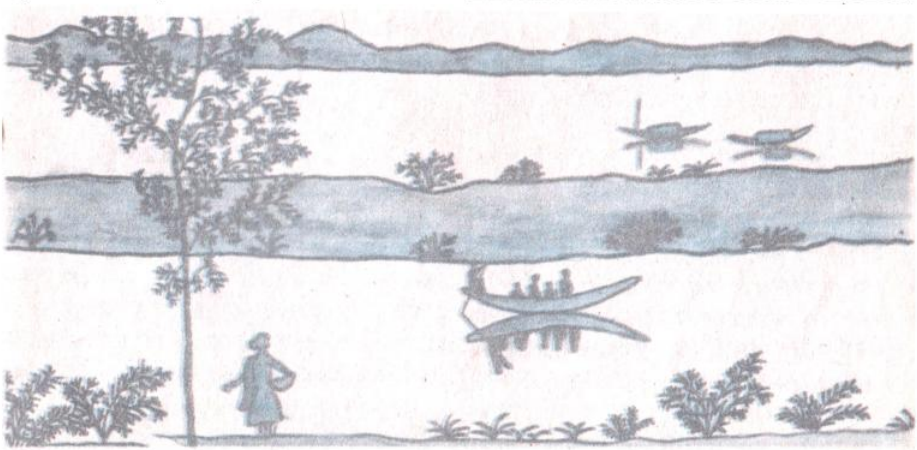

ছবি এঁকেছে **সোমশুভ্র দে** (বয়স ১১)

লোভী মানুষ ও ইঁদুর

(নাগাল্যাণ্ডের উপকথা)

আরতি দাস

বেশি লোভ করলে, অনেক সময় খুব জব্দ হতে হয়।

নাগাল্যাণ্ডের এক গাঁয়ে, এরকম লোভে পড়ে একজন লোক শেষটায় ভারী ঠকে গিয়েছিল। একদিন জঙ্গলের রাস্তায় হেঁটে বাড়ি ফিরছে লোকটি, এমন সময় একটা ইঁদুর ওর সামনে লাফিয়ে পড়তেই সে খপ . র ধরে ফেলল। তারপর বাড়ি ফিরে, চৌকো কাঠের বাক্সে আটকে রাখল ইঁদুরটাকে। নানা কাজের ব্যস্ততায় ইঁদুরের কথাটা ভুলেই গেল লোকটি।

হঠাৎ একদিন খেয়াল হতে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বাক্সের ঢাকনা তুলে দেখে যে, খুব সুন্দর দেখতে একটি মেয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে বাক্সের মধ্যে। মেয়েটির রূপ দেখে লোকটি দিশে হারিয়ে ফেলল একেবারে। ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝবার কোনও চেষ্টাই করল না। একবারও ভাবল না যে, একটা ইঁদুর চেহারা পালটে কোনমতেই মানুষ হয়ে যেতে পারে না। ব্যাপারটা আজগুবি, অসম্ভব। মনের আহ্লাদে লোকটি তখনই ছুটল মেয়েটির জন্য ভাল পোশাক কিনতে। ভাল ভাল খাবার খেতে দিল। আচমকা এত সুন্দর একটি মেয়েকে পেয়ে লোকটির মাথায় অনেকরকম মতলব এল। ও নিজে বেজায় গরিব। তাই অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করল, এই মেয়েটিকে খুব বড়লোকের সঙ্গে বিয়ে দেবে। তাহলেই ওর অবস্থা ফিরে যাবে। ইঁদুর, মানে ঐ মেয়েটিকে তো ও-ই ধরে এনেছে। সুতরাং মেয়ের অভিভাবক হিসেবে ওর যাকে খুশি তার সঙ্গেই বিয়ে দেবে।

দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড়লোক দেশের রাজা। ধনে, মানে, ক্ষমতায় রাজার চেয়ে আর বড় কে? তাই সাত-পাঁচ ভেবে একদিন লোকটি রাজার কাছে গেল।

তখন বিকেলের রোদ পড়ে এসেছে। রাজা তাঁর বন্ধুদের নিয়ে ধানসিঁড়ি নদীর ধারে এসেছেন বেড়াতে। লোকটি রাজাকে তার আর্জি জানিয়ে বলল, "খুব সুন্দরী একটি মেয়ে আছে আমার। আমার ইচ্ছে এ দেশে সবচেয়ে যার বেশি ক্ষমতা, তার সঙ্গেই বিয়ে দেব মেয়ের। আপনি রাজা। আপনার চেয়ে বেশি ক্ষমতা আর কার আছে?"

এ কথা শুনে রাজা একটু হাসলেন। তারপর বললেন, "তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে সত্যিই খুব খুশি হতাম। কিন্তু

মুশকিলটা হচ্ছে এই যে, আমার ক্ষমতা আর কতটুকু! ওই যে নদীটা দেখছ, আমার চেয়ে ওর শক্তি অনেক বেশি। আমি যদি এখন নদীর জলে নেমে যাই, তাহলে প্রচণ্ড স্রোত যে আমায় কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তাহলে আর নিজেকে সবার চেয়ে বড় বলি কী করে! না বাপু, তোমার মেয়েকে বিয়ে করার হিম্মত আমার নেই।''

রাজার কাছে নিরাশ হয়ে লোকটি নদীর কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল। নদীকে ডেকে বলল, "আমার পরমাসুন্দরী মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজছি। দেশের রাজার চেয়েও তোমার ক্ষমতা বেশি শুনে তোমার কাছেই এলাম। আমার মেয়েকে বিয়ে করো তুমি।"

ধানসিঁড়ি নদীতে তখন সূর্য ডুবে যাচ্ছিল। জোর বাতাসে ঢেউ উঠছে। লোকটির কথায় খলখল স্বরে হেসে উঠল নদী। বলল, "আমি সবার চেয়ে বড় এ কথা তোমাকে কে বলল? আমার চেয়ে বাতাসের শক্তি অনেক বেশি।"

এ কথায় খুব হতাশ হয়ে, নদীর পাড়ে বসে পড়ল ও। তবু হাল ছাড়ল না। জিজ্ঞেস করল, "বাতাস কী হিসেবে তোমার চেয়ে বড়, এ কথাটা আমায় একটু বুঝিয়ে বলবে?''

"কেন বলব না?" ডুবন্ত সূর্যের রাঙা আলোয় টকটকে লাল মুখে নদী জবাব দিল। "দেখ বাপু, আমি চুপ করে নিঃশব্দে বয়ে যেতে ভালবাসি। হৈ-হুল্লোড় দাপাদাপি এসব আমার ভালই লাগে না। কিন্তু ওই ডানপিটে বাতাসটার জন্য দুদণ্ড সুস্থির হবার জো আছে? কোত্থেকে উড়ে এসে হাওয়ার ঝাপ্টা দিয়ে দিয়ে এমন ঢেউ তুলবে যে, আমার সব জল টালমাটাল। সে ঢেউ সামলাতে আমি হিমশিম খাই। তাহলে? পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ বাতাসের ক্ষমতা আমার চেয়ে অনেক বেশি। এখন তুমিই বলো, তোমার মেয়েকে বিয়ে করাটা কি উচিত হবে আমার?"

নদীর কথায় ভারী মুষড়ে পড়ল লোকটি। কিন্তু বড়লোকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া তার চাই-ই। তা নইলে সে নিজে বড়লোক হবে কী করে? চিরটাকাল গরিব হয়েই থাকবে। একটা নিশ্বাস ফেলে লোকটি তখন বাতাসের উদ্দেশে গেল।

বাতাস তখন খুব ঠাণ্ডা মেজাজে পাহাড়ের গায়ে গা এলিয়ে শুয়ে আছে। খেয়াল-খুশি মতন কখনও শুকনো পাতাটা, নয় তো দু-চারটে খড়কুটো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে। তারপর চুপ। এমন সময় গাঁয়ের লোকটি তার কাছে গিয়ে উপস্থিত। বাতাস ওকে দেখে নড়েচড়ে উঠে বসল। বলল, "কে তুমি? কী চাই?"

অনেকটা পাহাড়ের চড়াই ভেঙে উঠে এসেছে বলে লোকটি ক্লান্তভাবে বসে পড়ল বাতাসের পাশে। তারপর বলল, "দেখুন, খুব সুন্দরী এক মেয়ে আছে আমার। এ-রাজ্যে সবার চেয়ে যে বড়, তার সঙ্গেই আমি বিয়ে দিতে চাই সে মেয়ের। এজন্য রাজার কাছে গিয়েছিলাম। রাজা বললেন, তাঁর চেয়ে বেশি ক্ষমতা আছে নদীর। আর নদীর কাছে শুনলাম যে, বাতাসের শক্তির কাছে সে বারবার হেরে যায়। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি আমার মেয়েটিকে বিবাহ করুন।"

এ-প্রস্তাব শুনে বাতাস একেবারে চুপ। তখন চারদিক নিঝুম। গাছের পাতাটিও নড়ে না। খড়কুটোও উড়ে এসে পড়ে না। সারা পাহাড় জুড়ে থমথমে রাতের অন্ধকার।

অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাতাস জবাব দিল, "দেখ হে, এ-কথা ঠিক, জল তোলপাড় করে নদীকে খুব নাজেহাল করতে পারি আমি। কিন্তু তা বলে আমাকেই সবচেয়ে বড় বলে ভাবছ কেন? ওই পাহাড়টা দেখ।"

এ কথা বলে বাতাস খাড়া পাথরের বিষম উঁচু পাহাড়টাকে দেখিয়ে বলল, "হাজার চেষ্টা করেও ওই পেল্লায় পাহাড়টাকে আমি একচুল নড়াতে পারিনি কখনও। কত বিদ্যুৎ-চমকানো মেঘলা হাওয়া, দমকা বাতাস আর ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা মেরে মেরে ক্লান্ত হয়ে গেছি, তবু ওকে একটুও নাড়া দিতে পারিনি। চিরটাকাল ও অচল, অনড়, স্থির দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। পাহাড়ের কাছে বাতাসের জারিজুরি খাটে না। সত্যি কথাটা শুনলে তো। এবারে আমি চলি। জানোই তো, এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকাটা আমার ধাতে সয় না।" এই বলে, চোখের পলকে বাতাস কোথায় উধাও হয়ে গেল।

লোকটা হতভম্বের মতো খানিক বসে থেকে উঠে পড়ল। এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ি রাস্তার চড়াই ভেঙে একেবারে পাহাড়ের চুড়োর কাছে পৌঁছে হাঁফ ছেড়ে ভাবল, যাক্, অ্যাদ্দিনে সবার চেয়ে যে বড়, তার কাছে আসা গেছে। এবারে সুন্দরী মেয়ের বিয়ের একটা কিছু হিল্লে হয়ে যাবেই। এই ভেবে ও পাহাড়কে ডেকে বলতে লাগল, "এই দুনিয়ায় আপনি সব চেয়ে শক্তিমান, সবার চেয়ে বড়। আমার পরমাসুন্দরী মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজছি আমি। আপনি দয়া করে রাজি হলেই আমার আশা পূরণ হয়।"

এ কথায় পাহাড় একটু সময় নীরব থেকে উত্তর দিল, "এ কথা ঠিক যে পৃথিবীর অনেকের চেয়ে আমার শক্তি বেশি। কিন্তু কী আশ্চর্য ব্যাপার, সামান্য এক ধড়িবাজ ইঁদুরের কাছে আমি হার মানি। ইঁদুর স্বচ্ছন্দে দাঁত দিয়ে কুরে-কুরে আমার গায়ে গর্ত খোঁড়ে। আমি না পারি ইঁদুরটাকে ধরতে, না পারি ওকে মারতে। আমি যত বড়ই হই না কেন, কাজের বেলায় দেখছি খুদে একটা ইঁদুরের কাছে হেরে যাচ্ছি। তাহলে আর নিজেকে সবার চেয়ে বড় বলে জাহির করব কী ভাবে? আর কোন্ মুখেই বা তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হব?"

তখন আরও বড়, আরও শক্তিশালী কারও খবর জানা নেই বলে মনের দুঃখে নিজের গাঁয়ে ফিরে গেল লোকটি। বাড়িতে ঢুকেই দেখতে পেল, পরমাসুন্দরী সেই মেয়েটি আবার যে-কে-সেই ইঁদুর হয়ে গেছে।

মেয়ের বিয়ে দিয়ে বড়লোক হবার আর কোনো আশাই থাকল না লোকটির।

ছবি দেবাশিস দেব

কথাবার্তার ধরন-ধারণ

প্রসাদ

আমরা যে সব সময়ে কথাবার্তা বলছি, সব কি ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী পুরোপুরি বাক্য রচনা করে করে বলি? যেমন ধরো, সম্পূর্ণ বাক্য যেখানে হওয়া উচিত ছিল :

তুমি কোথায় যাচ্ছ?
আমি খেলতে যাচ্ছি।

সেখানে আমরা বলি :

কোথায় যাচ্ছ?
খেলতে।

ইংরেজিতেও ওই রকম :

Going far?
Not very.

অর্থাৎ :

Are you going far?
I am not going very far.

কিন্তু অত বেশি কথা ইংরেজরা খরচ করে না, সংক্ষেপেই সেরে দেয়। এ নিয়ে একটা গল্প অনেকদিন আগে শুনেছিলাম, এই ফাঁকে বলে নিই। সে ইংরেজ আমলের কথা, চাকরির জন্যে নিরীহ বাঙালি ছেলেদের জবরদস্ত সায়েবদের সামনে ইনটারভিউ দিতে হত। তেমনি এক ইনটারভিউ দিতে এসেছে সদ্য বি-এ পাস যুবক। বাড়ি থেকে তাকে খুব করে শিখিয়ে-পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সায়েব কী কী জিজ্ঞেস করবে আর তার উত্তর কী দিতে হবে। প্রথমেই সায়েব জিজ্ঞেস করবে :

What is your name?

বলবি, মাই নেম ইজ অমুক, স্যার। তারপর সায়েব জিজ্ঞেস করবে :

Which district do you come from?

বলবি, আই কাম ফ্রম দি ডিসট্রিকট অব অমুক, সার।

এখন, বিপদ হল কি, ছেলেটি ঘরে ঢুকে কোনো রকমে চেয়ারে বসার পর সায়েব কটমট করে খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ গর্জন করে উঠল :

NAME?

ছেলেটা গেল ঘাবড়ে। একটা আওয়াজ হল সে শুনতে পেল, কিন্তু তার উদ্দেশ্যটা যে কী ভাল করে ঠাহর করতে পারল না। বুঝতেই

পারছ, একে সে বেচারি নার্ভাস তার ওপর সায়েবি উচ্চারণ। যাই হোক, আগে নাম বলতে হয়, সে জানে। সেইটাই সে কোনো রকমে বলে দেওয়া মাত্র, আবার গর্জন :

HOME?

ঠিক যেন শোনাল, 'হালুম!'

এর পর কি আর ইনটারভিউ দেবার মতো কারো মনের অবস্থা থাকে? ছেলেটি একেবারে ট্রামে উঠে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ছেলেটি যে নেহাত বোকা ছিল আর সায়েবটিও যে মস্ত বাহাদুর ছিল তা নয়, আসলে দেশের তখনকার অবস্থার জন্যে আমাদের ছেলেদের এই রকম অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়তে হত। নইলে, ইংরেজদের মুখের ইংরেজি কথা যদি আমরা টক-টক করে বুঝে ফেলতে না পারি, সেটা আমাদের কোনো লজ্জার বিষয় নয়।

যাই হোক, চামেলি-চম্বল আর তাদের মা-বাবার গল্পের মধ্যে অনেক কথোপকথন তোমরা পেয়েছ? নিশ্চয়ই লক্ষ করে থাকবে বাক্য প্রায়ই কেটে-ছেঁটে সংক্ষেপ করা হয়েছে। আসলে ওইরকমভাবেই বলে। যেমন :

Why do you love cats?
Because they're soft, cuddly things.

অর্থাৎ

I love cats because they're soft cuddly things.

কিংবা

Why doesn't she catch mice and eat them?
There are no mice in the house.

অর্থাৎ

She doesn't do that because there are no mice in the house.

আবার দ্যাখো :

Why do dogs always chase cats?
Alsatians don't (chase cats).

বন্ধনীর মধ্যেকার কথা দুটো আর বলার দরকার করে না।

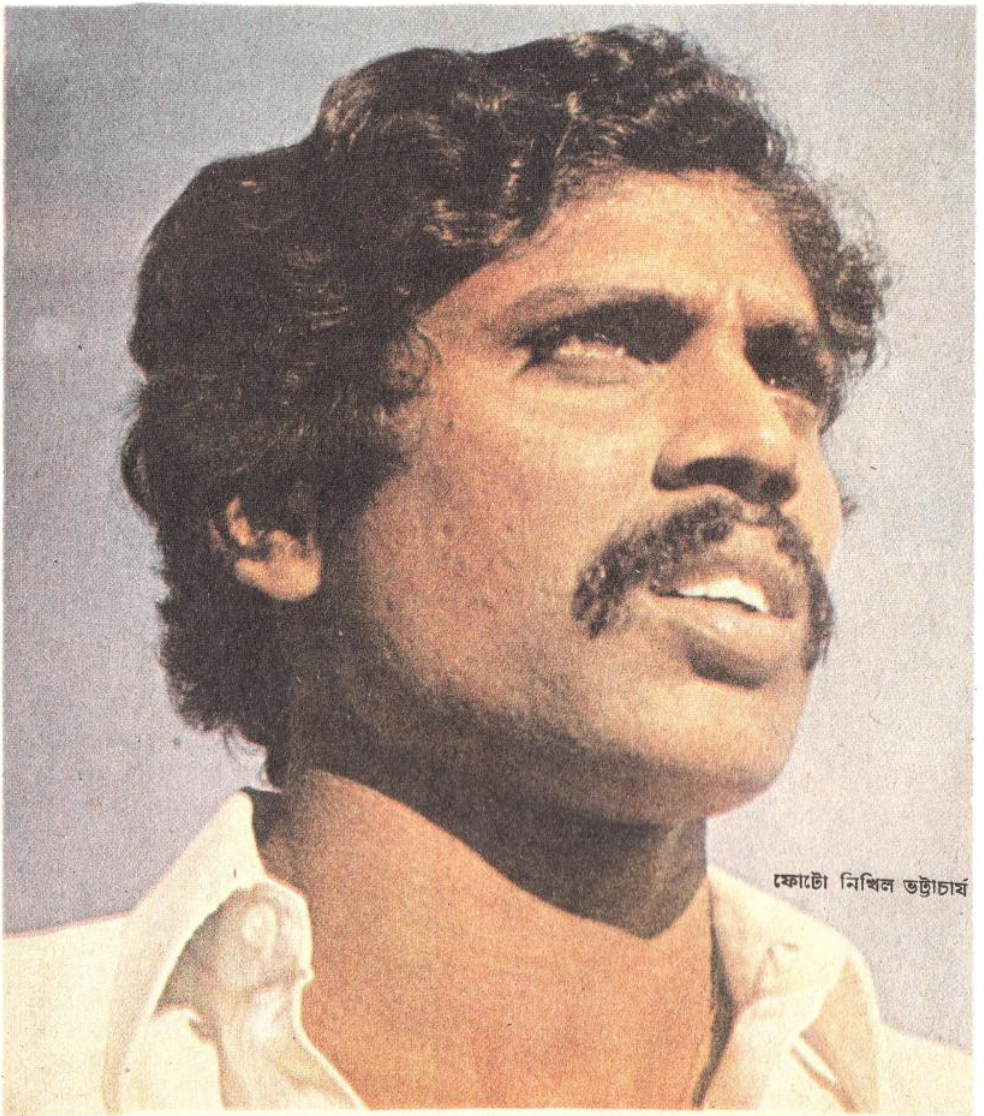

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

অল-রাউণ্ডার কপিলদেব

অলোক দাশগুপ্ত

১৯৭৬ সাল। বাংলা এবং হরিয়ানার মধ্যে রণজি ট্রফির আসর বসেছে চণ্ডীগড়ে। ১৭ বছরের দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠ এক যুবক মাত্র ২০ রানে ৭টি উইকেট দখল করে তাক লাগিয়ে দিলেন। ডাক পড়ল নির্বাচনী ট্রায়ালে। অস্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় ক্রিকেট দলে যুবকটি স্থান পেলেন না বটে কিন্তু নির্বাচকরা ও'র লড়িয়ে মেজাজ এবং বলের গতি আর সুইং দেখে মুগ্ধ হলেন।

কপিলদেব নিখাঞ্জের সাফল্যের সেই শুরু,

তারপর আর কখনও তাঁকে পিছু হটে যেতে হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি, সুনীল গাভাসকারের পর এমন আলোড়ন তুলে ভারতীয় দলে আর কেউ স্থান করে নিতে পারেননি।

তবে পাকিস্তানের ফৈজলাবাদে জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে কপিল কিন্তু তেমন সুবিধা করতে পারেননি। ৯৬ রানের বিনিময়ে সংগ্রহ করেছেন সাদিক মহম্মদের উইকেটটি এবং রান করেছেন মাত্র ৮। লাহোরের দ্বিতীয় টেস্টে ওঁর খেলায় কিছুটা উন্নতি দেখা গেলেও করাচি টেস্ট থেকেই কপিল ভারতীয় দলে নিজের স্থানটি পোক্ত করে নেন।

কালীচরণের ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে কখনও ব্যাট হাতে কখনও বল নিয়ে কপিলকে ঝলসে উঠতে দেখা গেছে। মাদ্রাজের চাঁপকে ভারত চতুর্থ টেস্ট জিতেছিল মূলত কপিল-দেবের কৃতিত্বে। ৩৮ রানে ৪ উইকেট এবং ৪৬ রানে ৩ উইকেট দখল করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাটিংকে প্রায় ভোঁতা করে দিয়েছিলেন তিনি। দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলায় ১২৮ বলে অপরাজিত ১২৬ রান (১১টি চার এবং ১টি ছয় সহযোগে) টেস্টে কপিলের সেরা ইনিংস। আমরা কলকাতাবাসীরা ইডেনের তৃতীয় টেস্টে ওঁর সংক্ষিপ্ত অথচ তেজোদৃপ্ত ৬১ রানের অনবদ্য ইনিংসটিকেও ভুলি কী করে?

টেস্ট ক্রিকেটের বাইরেও কপিলকে অনেক সময় সফল ক্রিকেটারের ভূমিকায় দেখা গেছে। ওঁর জীবনে প্রথম রণজি ম্যাচ রোহটকে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ১৯৭৫ সালে। ঐ ম্যাচে কপিল এক ইনিংসে ৩৯ রানে ছটি উইকেট দখল করেন। কপিলের সেরা বোলিং সার্ভিসেসের বিপক্ষে ৩৮ রানে আট উইকেট। তবে আজ পর্যন্ত ওঁর খেলোয়াড়-জীবনের সেরা কীর্তি সম্ভবত গত দলীপ ট্রফি ফাইনালে হ্যাটট্রিকটি। পরপর তিন বলে উনি ফিরিয়ে দেন পশ্চিমাঞ্চলের নামী ব্যাটসম্যান রাহুল মানকড়, যজুর্বেন্দ্র সিং এবং অশোক মানকড়কে। ঐ একই ওভারে কপিল কারসন ঘাউড়িকেও আউট করেন। আজ পর্যন্ত অন্য কোনো খেলোয়াড় দলীপ ট্রফিতে হ্যাটট্রিক করতে পারেননি।

নিখাঞ্জরা বংশপরম্পরাক্রমে কাঠ ব্যবসায়ী। ওঁদের আদি বাড়ি পাকিস্তানের শাহিয়ালের কাছে শা ইয়াকায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কপিলের বাবা নতুন শহর চণ্ডীগড়ে চলে আসেন। ১৯৫৬ সালের ৬ জানুয়ারি চণ্ডীগড়ে কপিলের জন্ম। তিন ভাইয়ের মধ্যে কপিল কনিষ্ঠ এবং মজার ব্যাপার এই যে, ৬ ফুট উচ্চতা নিয়েও তিনি দাদাদের চেয়ে মাথায় খাটো।

ছেলেবেলা থেকেই কপিল দৌড়ঝাঁপ করতে ভালবাসেন। তবে আজ যে তিনি সফল ক্রিকেটার হতে পেরেছেন তার অনেকটা কৃতিত্বই দাবি করতে পারেন দক্ষিণ পাঞ্জাবের প্রাক্তন রণজি খেলোয়াড় দেশপ্রেম আজাদ। সত্তর দশকের গোড়ায় যখন আমরা 'ফাস্ট বোলার চাই' বলে হাহাকার করছি তখন চণ্ডীগড়ে আজাদ কপিলকে ফাস্ট বোলার তৈরি করতে ব্যস্ত।

আজাদের স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে। কাক্কু (Kakku, বন্ধুদের কাছে কপিল এই নামেই পরিচিত) আজ সিম বোলিংয়ে ভারতের প্রধান আশা-ভরসা। ইংল্যাণ্ড সফর একজন ক্রিকেটারের খেলোয়াড়-জীবনের 'অ্যাসিড টেস্ট'। ওখানকার খামখেয়ালি আবহাওয়া এবং ভিন্ন চরিত্রের উইকেটের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে কপিল দারুণ বল করেছেন। চারটি টেস্টে ওঁর সংগ্রহ ১৬টি উইকেট, এজবাস্টনে ১৪৬ রানে ৫ উইকেট ওঁর টেস্ট জীবনের সেরা বোলিং। ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট-বোদ্ধারা একবাক্যে স্বীকার করেছেন কপিলদেবের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে।

এই রচনা শেষ করতে চলেছি, এমন সময় মাদরাজ থেকে যে খবর এল, তাতেও আমরা ব্যাটসম্যান হিসেবে কপিলের দক্ষতার নতুন প্রমাণ পাচ্ছি। কপিল সেখানেও বেপরোয়া ব্যাট চালিয়েছেন, এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ঝড়ের বেগে ৮৩ রান তুলেছেন। বলো, এমন অকুতোভয় তরুণকে ভাল না-বেসে পারা যায়?

তবে ইংল্যাণ্ড সফরে বোলার কপিল যতটা সফল, ব্যাটসম্যান কপিল প্রায় ততটাই ব্যর্থ। সাতটি টেস্ট ইনিংসে সংগ্রহ মাত্র ৪৮ রান। ব্যাটিংয়ে তাঁর কিছু পরিমার্জন দরকার। এই কাজে যদি তিনি সফল হন একমাত্র তবেই বর্তমান পৃথিবীর সেরা অল-রাউণ্ডার মাইক প্রোকটার, ক্লাইভ রাইস, ইয়ান বথামের সঙ্গে একই পংক্তিভুক্ত হতে পারবেন ভারতীয় ক্রিকেটের এই তরুণ প্রতিভা।

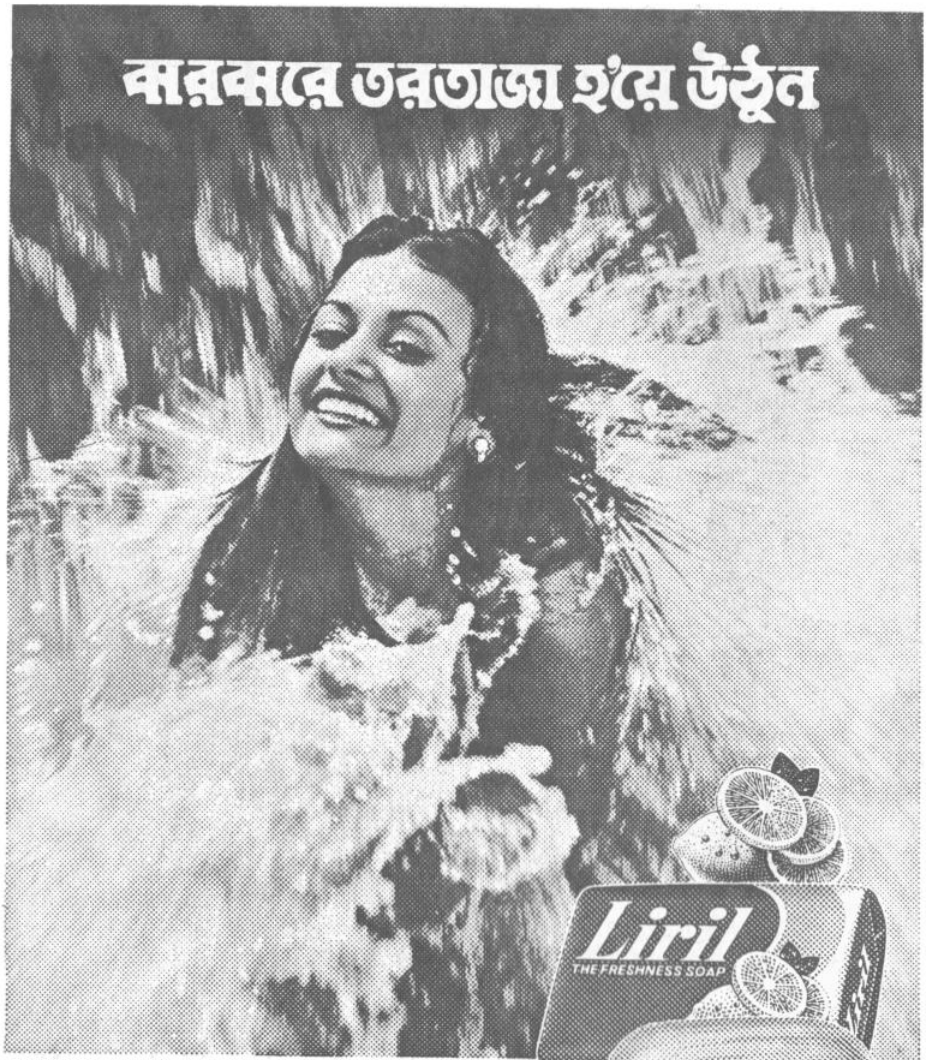

ঝরঝরে তরতাজা হ'য়ে উঠুন
Liril
THE FRESHNESS SOAP
Liril
লিরিল
লেবুর মত চনমনে তরতাজা
হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

রেফারীর সমস্যা

পুষ্পেন সরকার

প্রতুল চক্রবর্তী

"মোহনবাগান ও কালীঘাটের লীগের খেলা। সালটা ঠিক মনে নেই। মোহনবাগান অনেক বেশি শক্তিশালী দল। প্রথমার্ধে কয়েকটা সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করায় মোহনবাগান গোল করতে পারল না।

"দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগান একতরফা খেলছে। কিন্তু কিছুতেই গোল হচ্ছে না। মাঠে দারুণ উত্তেজনা। খেলার শেষ বাঁশি বাজার সময় যত এগিয়ে আসছে উত্তেজনা তত বাড়ছে।

"খেলা শেষ হতে সাত-আট মিনিট বাকি। মোহনবাগানের রাইটআউট রবি দাস ডান দিক থেকে কালীঘাট গোলের সামনে উঁচু করে সেন্টার করলেন। হেড করার জন্য রমন লাফিয়ে উঠলেন। রমন বল মাথায় পেলেন না। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি বাঁ হাতটা ছুঁইয়ে দিলেন বলে। গোলে ঢুকে গেল বল। সারা মাঠ গোল-গোল শব্দে ফেটে পড়ল। গ্যালারিতে নাচানাচি। আমি রমনের বিরুদ্ধে হ্যান্ডবলের নির্দেশ দিলাম। শেষ পর্যন্ত খেলা ড্র হল।

"মাঠ থেকে বেরুচ্ছি। হঠাৎ একজন চায়ের খুরি ছুঁড়ল মাথায়। মাথাটা ঘুরে গেল। তাকিয়ে দেখি, পরনের সাদা গেঞ্জি রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে।

"সেদিন অঝোরে কেঁদেছিলাম। ব্যথার জন্য নয়। বার বার মনে হচ্ছিল, ভাল রেফারিং করার এই কি পুরস্কার?

"তারপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। খেলা ছেড়ে রমন হয়েছেন কোচ। নওগাঁয় জাতীয় ফুটবলের আসর বসেছে। গোয়ার কোচ হয়ে এসেছেন রমন। দেখা হতেই রমন আমায় জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমায় মাফ কর চক্রবর্তী সাহেব।' আমি হকচকিয়ে রমনের মুখের দিকে তাকালাম।

"রমন বললেন, 'তোমার মনে নেই। কিন্তু আমি ভুলতে পারিনি। অনুশোচনায় ছটফট করি, যখনই মনে আসে সেদিনের সেই ঘটনা। সেদিন দর্শকদের কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিলে তোমার মাথা ফাটত না।' আমি অভিভূত হয়ে রমনকে বুকে টেনে নিয়েছিলাম।

"ইস্টবেঙ্গল ও ইস্টার্ন রেলের লীগের খেলা। ইস্টবেঙ্গলের গোলে মণি ঘটক। ব্যাকে ডাঃ কুমার ও ব্যোমকেশ বসু। ইস্টার্ন রেলে প্রদীপ ব্যানার্জি, প্রদ্যোত বর্মনরা খেলছেন। দু দলই বেশ শক্তিশালী। কোনো গোল হয়নি। খেলার প্রায় শেষ দিকে ডাঃ কুমার পেনাল্টি বক্সের মধ্যে গোলের সামনে বিপক্ষ দলের একজন ফরোয়ার্ডকে ট্রিপ করলেন। বলটা ডাঃ কুমারের গায়ে লেগে গোল লাইন পার হয়ে গেল।

"আমি পেনাল্টি দেব সিদ্ধান্ত নিয়ে বাঁশি বাজালাম। কিন্তু হঠাৎ আমার কী হল জানি না। কর্নার ফ্ল্যাগের দিকে হাত তুলে দেখালাম। ডাঃ কুমার বুদ্ধি খাটিয়ে সাইড থেকে ট্রিপ করেছিলেন। দর্শক-আসন থেকে কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না।

"খেলা শেষ হলে মাঠ থেকে ফিরছি। অনুশোচনায় নিজে দগ্ধে মরছি। রেলের বাঘা সোম বললেন, 'এটা কী করলে?' উত্তরে বলেছিলাম, 'ভুল করেছি।' কেন এমন করলাম জানি না। বহু বছর চলে গেছে। আজও ভুলতে পারিনি নিজের এই অপরাধ।

"১৯৫৯ সাল। এর্নাকুলামে এশিয়ান কাপ ফুটবলের পশ্চিম অঞ্চলের খেলা। ভারত, পাকিস্তান, ইরান ও ইজরাইলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইজরাইল ও ইরানের খেলা।

প্রতিযোগিতার সেরা ম্যাচ। ফল ৩-৩। দারুণ উত্তেজনার মধ্যে খেলা শেষ হল। হোটেলে ফিরে বিশ্রাম করছি। হঠাৎ ভারতের কোচ রহিম সাহেব এসে হাজির। সঙ্গে পাকিস্তানের কোচ।

"দুজনে ঘরে ঢুকে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'চক্রবর্তী, তুমি আজ যেভাবে বাঁশি বাজিয়েছ তাতে আমরা গর্ব অনুভব করছি।' পাকিস্তান ম্যানেজার বললেন, 'আমাদের সব খেলাতে তুমি বাঁশি বাজাবে। কর্মকর্তাদের কাছে আমি অনুরোধ করেছি।'"

এমনি অনেক আনন্দ ও দুঃখের ঘটনা ঘটেছে রেফারী প্রতুল চক্রবর্তীর জীবনে। ঢাকায় রেফারী ছিলেন। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত কলকাতার মাঠের নামী রেফারী।

ভারতের তিনি একমাত্র রেফারী যিনি জুলেস রিমেট কাপের (এখন বিশ্বকাপ) খেলায় বাঁশি বাজিয়েছেন। ভারতের রেফারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম 'ফিফা' ব্যাজ (আন্তর্জাতিক ব্যাজ) পেয়েছেন। মারডেকা ফুটবল ফাইনালে বাঁশি বাজাবার গৌরব তিনি ছাড়া আর কোন ভারতীয় রেফারী পাননি।

এ ছাড়া ডুরান্ড ফাইনাল, আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল, বিদেশী দলগুলির ভারতে বহু খেলা এবং কলকাতায় গুরুত্বপূর্ণ অনেক খেলায় রেফারী হিসাবে প্রচুর সুনাম পেয়েছেন প্রতুল চক্রবর্তী। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের

মিলন দত্ত

গুরুত্বপূর্ণ লীগ খেলায় কম করে আটবার তিনি বাঁশি বাজানোর দায়িত্ব পালন করেছেন দু'দলের অগণিত সমর্থকদের খুশি করে।

"১৯৭৩ সালের ১৬ আগস্ট দিনটির কথা ভোলার কোনো উপায় নেই। সেদিন থেকেই খবরের কাগজের বড় অক্ষরের হেডিংগুলো ভাল ভাবে পড়তে পারি না। ছোটগুলো তো একেবারেই অন্ধকার। মাঠ থেকে নিয়ে গিয়ে সোজা পি জি হাসপাতালে আমাকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। বিখ্যাত চোখের ডাক্তার সমীর বিশ্বাস আমাকে ভাল করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। এমনই কপাল! ভাল করে সারার আগেই ডাক্তারবাবু মারা গেলেন। আর চিকিৎসা হল না। কোনোরকমে অফিস করি। রিজার্ভ ব্যাংকের পাকা চাকরি। সহকর্মীরা ভালবাসেন। তাই চাকরিটা টিঁকে আছে। রাস্তায় চলা-ফেরা করতে অসুবিধা হয়। কিন্তু এমনই নেশা যে, ফুটবল মাঠে পড়লেই আমি ময়দানে যাই।

"সেদিন ছিল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের লীগের খেলা। আমি রেফারী। ইস্টবেঙ্গল এক গোলে জিতেছিল। খেলা শেষ হয়েছে। মাঠে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ একজন খেলোয়াড় (যিনি সেদিন জার্সি পরে মাঠের বাইরে আগাগোড়া বসে ছিলেন) ছুটে এসে আমার চোখের উপর ঘুসি চালালেন। রক্তে ভেসে গিয়েছিল চোখ-মুখ। অন্ধকার নেমে এসেছিল দু'চোখে।

"সেই সময় থেকেই দুটো চোখ প্রায় অকেজো। অনুতপ্ত খেলোয়াড়টি অনেক দিন পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করে গেছেন। আমার নিজেরও কোনো অভিযোগ বা অভিমান নেই। এটাই ছিল আমার নিয়তি!

"কলকাতার মাঠে খেলা দেখার প্রবল ইচ্ছা ছেলেবেলা থেকেই। খেলোয়াড় হওয়ার যোগ্যতা ছিল না। তাই রেফারী হয়ে খেলা দেখার পথ বেছে নিয়েছিলাম। বাড়ির নিষেধ শুনিনি। অফিসের পদোন্নতি উপেক্ষা করেছি। তিনটে বাজলেই অফিসে আর মন বসত না। চলে যেতাম রেফারীদের তাঁবুতে। দারুণ নেশা। বাঁশি হাতে মাঠে নামলে ভুলে যেতাম পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ-বেদনা।

"শুধু যে দুঃখ ও বেদনা পেয়েছি ভাবলে

ভুল করা হবে। ভালবাসা ও সম্মানও জানিয়েছেন চেনা অচেনা বহু মানুষ। বাংলার বাইরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এবং জাতীয় ফুটবলের আসরেও সম্মান ও মর্যাদা পেয়েছি। জেনেশুনে কোনো অন্যায় বা অবিচার করিনি।''

বিশ্বনাথ দত্তর মতো এতবড় আঘাত বোধ হয় কলকাতার আর কোনো রেফারী পাননি। ১৯৫২ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত টানা ২২ বছর কলকাতার লীগ ও শীল্ডে বহু বড় খেলায় বাঁশি বাজিয়েছেন তিনি। ১৯৭১ ও ১৯৭২ পরপর দুবছর জাতীয় ফুটবলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ খেলা পরিচালনার দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হয়েছে।

চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি হারাবার পর ১৯৭৪ সালে ক্যালকাটা রেফারীজ অ্যাসোসিয়েশানের সম্পাদকের সম্মানও পেয়েছেন। একটিই মোটে ক্ষোভ। ''আই এফ এ আমার চোখের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলে বাকি জীবনটা স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারতাম।''

''সে যে কী যন্ত্রণা বোঝাতে পারব না। মাঠভর্তি লোক। মাঠের বাইরে জনসমুদ্র। সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন—কখন খেলা শুরু হবে। মোহনবাগান ও ইস্ট-বেঙ্গলের খেলোয়াড়রা মোহনবাগান মাঠে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে। কে আগে, আর কে পরে নামবে—তাই নিয়ে ছেলেমানুষি। আমি দশ মিনিট অপেক্ষা করে খেলা হবে না বলে সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম। কিন্তু আমি জানতাম যে, খেলা না হলে দারুণ গোলমাল হতে পারে। তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল প্রায় ৫৫ মিনিট।

''কৃষ্ণনগরে জাতীয় ফুটবলের আসর বছর পাঁচ-ছয় আগেকার ঘটনা। বাংলা ও কেরলের সেমিফাইনাল। দু' দলের শক্তি সমান-সমান। বাংলা এক গোলে হারল। সারা কৃষ্ণনগর চটে গেল আমার ওপর। বাংলার পরাজয়ে আমার দুঃখ আর কারও চাইতে কম হয়নি। কিন্তু আমার আনন্দ এই যে, রেফারী হিসাবে আমার দায়িত্ব সেদিন আমি নিখুঁত ভাবে পালন করতে পেরেছিলাম।''

মহমেডান মাঠ। পুলিস ও মহমেডানের লীগের খেলা। সালটা বোধহয় ১৯৭৫। মাঠের সবুজ আসনে তিল ধারণের জায়গা নেই। এক

বিশ্বনাথ দত্ত

একটি গোল হাবিব করছে আর সারা মাঠ পাগলের মতো লাফাচ্ছে। হাবিব হ্যাটট্রিক করার সঙ্গে সঙ্গে সবুজ আসন থেকে অনেক দর্শক মাঠের রেলিং টপকে ঢুকে পড়লেন। ''ভাবলাম, হাবিবকে ওরা বোধ হয় অভিনন্দন জানাতে এসেছেন। খেলার দিকে এত মন ছিল যে গ্যালারিতে কী হয়েছে বুঝতেও পারিনি। খেলা শেষ হওয়ার পরে জানতে পারলাম যে, গ্যালারির কিছু অংশ ভেঙে পড়েছে। দুর্ঘটনায় একটি বালক মারাও গেছে।''

এইরকম একটি পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছিল তরুণ রেফারী সুধীন চ্যাটার্জিকে। হকি এবং ক্রিকেট দুটো খেলাই মোটামুটি ভাল খেলতেন। প্রথম ডিভিশনের বিভিন্ন দলের হয়ে খেলেছেন প্রায় ১৫ বছর।

ফুটবল রেফারী ১৯৬৩ সাল থেকে। গত বছর আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে এবং মোহনবাগান - ইস্টবেঙ্গলের গুরুত্ব-পূর্ণ লীগ খেলায় বাঁশি বাজাবার দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হয়েছিল। ফেডা-রেশন কাপ, ডুরান্ড কাপ, এশিয়ান স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপ এবং কলকাতায় বহু গুরুত্ব-পূর্ণ লীগ ও শীল্ডের খেলায় কড়া মেজাজের রেফারী সুধীন চ্যাটার্জিকে সমীহ করে চলেন সব দলের খেলোয়াড়রা।

গতবছর লীগের গোড়ার দিকে ইস্ট-বেঙ্গল হেরে গেল এক গোলে উয়াড়ির কাছে।

সুধীন চট্টোপাধ্যায়

মাঠ উত্তেজনায় ফেটে পড়েছিল। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা নানা ভাবে তাঁদের বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন, দলের খেলোয়াড়, কোচ ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেদিন রেফারীর সুবিচারের বিরুদ্ধে একজনও বিরূপ মন্তব্য করেননি।

গতবছর লীগের আর একটি ঘটনা। ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের লীগের প্রদর্শনী খেলা। ইস্টবেঙ্গল ২—০ গোলে জিতেছিল। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের একজন ফরোয়ার্ডের একটা জোরালো শট সমরেশ চৌধুরী গোল লাইনের উপর থেকে বাঁচিয়েছিলেন। গোলের দাবি উঠেছিল কয়েকজন খেলোয়াড়ের কাছ থেকে। সমর্থকরাও কিছুটা উত্তেজিত হয়েছিলেন। "আমি খুব কাছে কাছে ছিলাম। পরিষ্কার দেখেছিলাম। সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার কথা মনেই আসেনি।"

এমনি অনেক ঘটনা তরুণ রেফারী মিলন দত্তের সামনে এসেছে। ১৯৬২ সাল থেকে বাঁশি বাজাচ্ছেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত দর্শক বা সমর্থকদের আক্রোশের সামনে পড়তে হয়নি। বাস্কেটবল এবং ফুটবল দুটি খেলারই জাতীয় রেফারী। ১৯৭৮ সাল থেকে কলকাতায় এবং ঐ বছরে শ্রীনগরে দুটি জাতীয় ফুটবলের আসরে অনেকগুলি খেলায় বাঁশি নিয়ে মাঠে নেমেছেন। এবং সুনামের সঙ্গে মাঠ থেকে ফিরেছেন। ফেডারেশন কাপ, ডি সি এম, জুনিয়র জাতীয় ফুটবল প্রভৃতি নানা প্রতিযোগিতার অনেক গুরুত্বপূর্ণ খেলায় তাঁকে রেফারীর গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। এ ছাড়া কলকাতায় লীগ ও শীল্ডের বহু খেলায় তিনি বাঁশি বাজান।

কলকাতা থেকে বাইরের যে-কোনো প্রতিযোগিতার খেলা পরিচালনা করে বেশি আনন্দ পান মিলন দত্ত। তিনি বলেন, বাইরে দর্শকদের চাপ রেফারীর উপর অনেক কম। আর কলকাতায় ঠিক উলটো। বড় দলগুলির সমর্থকরা ছোট দলগুলির বিরুদ্ধে যে-কোনো উপায়ে জিততে চান। এবং রেফারী সুবিচার করলে তিনিও অপরাধীর তালিকায় পড়েন। মিলন দত্তর দৃঢ় বিশ্বাস, সমর্থক এবং সদস্যরা প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব নিয়ে মাঠে এলে, খেলার মান উন্নত হবে। কলকাতার মাঠে খেলা পরিচালনার সময় রেফারী লাইনসম্যান এবং খেলোয়াড়দের লক্ষ করে ইঁট পড়ে। কিন্তু কাশ্মীরে জাতীয় ফুটবলের সময়ে মিলন দত্ত মাঠে বহু আপেল কুড়িয়েছিলেন।

আমেরিকার প্রিন্সটন শহরে উচ্চতর বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রে স্থায়ীভাবে বাস করবার জন্যে আইনস্টাইনকে একটি বাড়ি দেওয়া হয়েছে। এর কিছুদিন পরে, প্রিন্সটন কলেজের ডীনের অফিসে টেলিফোন করে এক ভদ্রলোক প্রথমে তাঁর খোঁজ করলেন; ডীন ঘরে নেই শুনে তাঁর সেক্রেটারির কাছে ডঃ আইনস্টাইনের বাসার ঠিকানাটা জানতে চাইলেন। সেক্রেটারি সবিনয়ে জানালেন, ডঃ আইনস্টাইন নিরিবিলি থাকতে চান বলে তাঁর ঠিকানা কাউকে দেওয়া বারণ আছে। অপর প্রান্তে ভদ্রলোক গলাটা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, "আপনাকে চুপি-চুপি বলছি, আমিই ডঃ আইনস্টাইন। একটু বেরিয়েছিলাম, ফেরার সময় বাসার ঠিকানাটা কিছুতেই মনে করতে পারছি না।"

কুঁইমামার হাঁচি

বীরেন্দ্র দত্ত

আসল নাম ছিল অবনীমোহন পাকড়াশী। আমরা ডাকতাম কুঁইমামা বলে। কুঁইমামা ছিলেন মায়ের কীরকম যেন দূর-সম্পর্কের ভাই। মায়ের থেকে বছর দশেকের ছোট। আমাদের বাড়ি প্রায়ই আসতেন। খুব মজার-মজার গল্প করতেন। জীবনে অনেক দুর্ধর্ষ কাজ করেছেন, করতে পারেন, এমন সব ঘটনা বুক ফুলিয়ে আমাদের কাছে বলে যেতেন। আমি, টুবলু, বুকাই—ছোট ছোট ভাইবোনেরা অবাক হয়ে শুনতাম। শুনতে শুনতে কুঁই-মামাকেই জীবনের আদর্শ করে নিয়েছিলাম তখন।

কুঁইমামার চেহারা কিন্তু কোনদিনই মোটা-সোটা ছিল না। অন্তত প্রথম যেদিন আমাদের বাড়ি ওঁকে দেখি, কেমন খারাপ লেগেছিল। পাতলা রোগা চিমসে চেহারা, সারা গায়ে ঘন লোম, খোঁচা-খোঁচা গোঁফ। প্রচুর সিগারেট খেতেন, আর এক ঘণ্টা অন্তর মা ওঁকে চা যুগিয়ে যেতেন। চোখ দুটো বড়, গোল-গোল। সব সময়ে লালচে। হাতে পায়ে মাংস ছিল না, শুধু হাড়ের ওপর যেন ভার্নিশ-করা খসখসে মোটা কাগজ বসানো। মাথায় ঝাঁকড়া চুল।

এই চেহারায় কুঁইমামা কী করে ওইসব দুর্ধর্ষ কাজ করতেন! কুঁইমামাকে একবার জিজ্ঞেস করতে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, "চুপ কর। এখন এসব বুঝবি না। বড় হলে বুঝতে পারবি।"

এরপর আর কোনোদিন ওসব কথাই তুলিনি।

এই কুঁইমামার নাম কী করে কুঁইমামা হল, তা অবশ্য আমরা জানি। কারণ নামটা আমার বন্ধুদের মুখ থেকেই তৈরি হয়ে যায়। তা হয় যেদিন মামাকে প্রথম আমাদের বাড়ি দেখি সেদিন থেকেই।

স্কুল থেকে ফিরছি। সঙ্গে ক্লাসের বন্ধু পিলপিলে, ফাতুন আর চিপ্পি। ছুটির পর ফাতুন বলল, "এই চল, আজ চিপ্পিদের বাড়ি যাই।"

পিলপিলে আঁতকে উঠে বলল, "ওরে বাবা, চিপ্পিদের বাড়ি কুকুর আছে, আমি যাব না।"

পিলপিলের ছিল কুকুরে ভীষণ ভয়। কারও বাড়ি কুকুর আছে জানলে সে-বাড়ির পথ মাড়াত না।

চিপ্পি বলল, "ফাতুনদের বাড়িও তো যাওয়া যাবে না। ওখানেও কুকুর।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে, আমাদের বাড়ি আয়।"

আমাদের বাড়ির সামনে এসেছি, রাস্তার জানলার সামনে দিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ পিলপিলে চেঁচিয়ে উঠল, "এই, কুকুর-বাচ্চার শব্দ!"

আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। হঠাৎ কানে এল, আমাদের ঘর থেকে কুকুর-বাচ্চার চাপা স্বর। আর কিছু শোনার আগে পিলপিলে তো দে-দৌড়।

চিপ্পি বলল, "কী ব্যাপার রে! তোদের বাড়িতেও তো কুকুর!"

"যাঃ," আমি কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বললাম, "হতেই পারে না। আয় তো দেখি কী ব্যাপার!"

সকলে ঘরে ঢুকেই যাকে দেখি, তিনি আমাদের সেই প্রথম-দেখা মামা। মায়ের কী কথায় 'কুঁই কুঁই' করে হেসে ইজিচেয়ারে ছটফট করছেন। আমাদের দেখে হাসি থামালেন। পরে দেখেছি, যে কোন ব্যাপারে বেশ খুশি হলে এরকম হাসি ওঁর আসেই।

এরপর থেকে ঠিক এই 'কুঁই কুঁই' হাসি বহুবার শুনেছি। সেই প্রথমদিন থেকে চিপ্পি, পিলপিলে ওঁর নাম দেয় কুঁইমামা। আমিও তাই বলি, হাসতে হাসতে মা-ও নিজেদের মধ্যে নামটা মেনে নেন এক সময়ে।

এই কুঁইমামা হঠাৎ দেখলাম, আমাদের বাড়ি আসা বন্ধ করেছেন। মাকে জিজ্ঞেস করলাম, "মা, কুঁইমামা আসছেন না কেন?"

"ও যুদ্ধে চাকরি পেয়েছে। চলে গেছে।"

"কুঁইমামা যুদ্ধে গেছেন!"

"হ্যাঁ, যুদ্ধ শেষ হলে ফিরবে।"

মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে মনে বললাম, হে ভগবান, কুঁইমামা যেন যুদ্ধ থেকে ভালভাবে ফিরে আসেন। আরও কত গল্প শুনতে পাব তা হলে!

আর সত্যি সত্যি যুদ্ধ শেষ হবার এক মাস পরেই কুঁইমামা ফিরে এলেন! আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমরা সকলে। কুঁইমামাকে একেবারে চেনাই যায় না!

সে কুঁইমামা আর নেই। ইয়া মোটা-সোটা চেহারা। মাথার আগের ঝাঁকড়া চুলে এখন কদম ছাঁট। ঘাড়ে চর্বির কয়েকটা খাঁজ। গোঁফ-জোড়া মোলায়েম হয়ে দু পাশের কান পর্যন্ত পাট্টাই হয়েছে। লম্বা ঝোলানো জুলফি ছোঁয় ছোঁয়! চাঁছা দাড়ি। প্যান্ট-বুশশার্ট পরা। গায়ে মাংস লেগে আরও ফর্সা হয়ে গেছেন। এখন কথায় সেই হাসি নেই, হাসলেও সেই কুঁই কুঁই শব্দ নেই! ফর্সা দাঁতে মৃদু হাসেন।

আমি কেন যেন একটু পাশে ঘেঁষে কুঁইমামার গা ছুঁই, আর ভাবি, সত্যি সেই কুঁইমামা তো?

সে-রাতে এক মজার ব্যাপার দেখলাম। কুঁইমামার সেই হাসি গেছে, কিন্তু অদ্ভুত ধরনের এক হাঁচি দেখা দিয়েছে তাঁর। হাঁচির শব্দটা হল—'ছিঃ... হঁ অঁ অঁ অঁ...।' 'ছিঃ' শব্দটা নিচু সুরে হওয়ার পর এক সেকেণ্ড স্তব্ধতা, তারপরেই হাঁচির টাল সামলাতে 'হঁ অঁ অঁ অঁ...' শব্দে একটা টান, ধ্বনি বেশ জোর। এই টানের মধ্যে কুঁইমামার লোমশ ভুঁড়িতে কয়েকটা কম্পন হয় যা দেখার মতো! আর কুঁইমামার এই হাঁচিটা একবার শুরু হলে ঠিক পরপর তিনবার হয়ে তবে থামত।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর মা হাসতে হাসতে বললেন,—"হ্যা রে অবনী, এরকম হাঁচি কোত্থেকে পেলি?"

কুঁইমামাও হাসলেন। সেই কুঁই কুঁই হাসি নয়, গালভরা গোঁফ-নাচানো হাসি হেসে বললেন, "দেখ দিদি, এই হাঁচিটায় যা দারুণ আরাম হয় না!"

"তা বলে পাড়া-জাগানো হাঁচি!" মা চোখ বড় করে বললেন।

"যখন পাড়া জাগাবার কথা বললেই দিদি, তখন শোনো, আমার এই হাঁচি কত বড় একটা কাজ করেছে।"

"বড় কাজ! সে আবার কী?" মায়ের হালকা স্বরে চাপা বিস্ময়।

আমরা ছোটরা কুঁইমামাকে ঘিরে বসলাম। কুঁইমামা শুরু করলেন, "আমাদের সৈন্যরা তখন ফ্রন্টে তুমুল যুদ্ধ করছে। রক্তারক্তি ব্যাপার। যারা আহত হচ্ছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে আনা হচ্ছে। আমি ছিলাম সৈন্যদের খাবার-দাবারের স্টোরের পাহারাদার। আমি আগে অবিশ্যি অন্য জায়গায় ছিলাম, পরে আমাকে ওই স্টোরে নিয়ে এল। কারণ স্টোর থেকে প্রায়ই চুরি যেত মালপত্তর। ধরা যাচ্ছিল না কিছুতেই। ওপরওলা আমার পুরনো ক্যারেকটার সার্টিফিকেট হঠাৎ একদিন দেখে আমাকেই ওখানে বহাল করল। আমার তখন কাজ কম। খাই-দাই আর স্টোর পাহারা দি। আর রাত হলেই খুব সতর্ক থাকি চোর ধরার জন্যে। এদিকে আমি আসার পর কদিন চোর ঘেঁষলই না। একদিন গভীর রাতে আমার এই হাঁচির জন্যেই বাছাধন ধরা পড়ে গেল।"

কুঁইমামা একটু যেন দম নিলেন।

"হাঁচির জন্যে!" মা অবাক কণ্ঠে বললেন।

"হ্যাঁ, এই হাঁচির জন্যেই! শোনো না। কর্তাদের কথামতো আমি তো স্টোরের মধ্যেই শুতাম। সেদিন একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেছে। শীতের রাত! ঠাণ্ডায় মাথাটা ভার-ভার। একটু ঘুমিয়েও পড়েছিলাম বোধহয়। নাকটা সুড়সুড় করছিল। হাঁচতে গেছি, হাঁচি অর্ধেকটা হয়ে আটকে গেল। আর এক দমকে হাঁচতে গেছি, আবার আটকে গেল। শেষবারেও সেরকম। আর তখনি গেল ঘুমটা ভেঙে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, স্টোরের দরজা খোলা। খোলা দরজা দিয়ে একটা লোক দৌড়ে পালিয়ে গেল। হাতের টর্চ জেবলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসি। বাইরে থেকে কী করে যেন দরজা খুলেছে চোরটা! কিন্তু জিনিসটা বাছাধন নিতে পারেনি!" কুঁইমামার চোখে-মুখে হাসির ছাপ।

"জিনিসটা কী?" টুবলু উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"একটা বড় ওয়াল ক্লক্। স্টোরের দেয়ালে টাঙানো থাকত। খুব দামী। ইংরেজরা ওদের দেশ থেকে আনিয়েছিল।"

"তা, তুমি জেগে গেছ বুঝতে পেরেই সে জিনিসটা ফেলে রেখে পালাল?" এবার আমি জিজ্ঞেস করি।

"উঁহু, তা নয়।" খুব ভারিক্কি ভঙ্গিতে কুঁইমামা বললেন, "দিন কতক পরে মুখ কাঁচুমাচু করে একজন আমার কাছে এসে হাজির। তখন তো জানতাম না সেই ব্যাটাই চোর। পায়ে পড়ে যা বলল, তার মোদ্দা কথাটা হল, 'বাবু, আমায় ক্ষমা করুন। আর কোন-দিন চুরি করব না। আমি অনেক পাপ করেছি। ভগবান আমায় শাস্তি দিয়েছেন।'"

"কী করে শাস্তি দিল ভগবান?'' মা চেপে ধরলেন।

"আরে আমিও তো প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরে ও যা বলল, তাতেই বুঝলাম সব। হয়েছে কী, আমি তো হাঁচতে গিয়ে তিনবারই আটকে যাই। প্রথমে 'ছিঃ' শব্দ হয়, তিনবারই শুধু 'ছিঃ ছিঃ ছিঃ' শব্দটা ওই নির্জন অন্ধকারে ওর কানে আসে। লোকটা জানত, ওই স্টোরের মধ্যে কেউ থাকে না। ওই 'ছিঃ' শব্দে ওর মধ্যে পাপবোধ জেগে ওঠে, ভাবে ওর ভগবান বুঝি ওকে ধিক্কার দিচ্ছে। তাই ও ঘড়িটা ফেলে রেখে পালায়।'' কুঁইমামা থেমে যান। কী যেন ভাবেন।

টুবলু সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, ''তারপর?''

কুঁইমামা গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে বলতে থাকেন, "আমি তাকে বড় সাহেবের কাছে নিয়ে যাই। বড় সাহেব অবাক হয়ে শুধু বললেন, 'পাকড়াশী, তোমার ওই হাঁচির শব্দে অন্যদের ঘুমের ব্যাঘাত হত বলেই তোমাকে স্টোরে পাঠাই। তুমি দেখছি তাতে চোর ধরেছ, আবার চোরের চরিত্র সংশোধন করেছ ওই হাঁচি দিয়ে! ভেরি ইন্টারেস্টিং! তাই তোমার প্রমোশন তো হলই, আর—' "

আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, "চোরটার কী হল?"

"সায়েব দেখল চোরটা ভাল হয়ে গেছে। ওর কান্নাকাটিতে আর আমার কথায় ওকে একটা চাকরি দিয়ে দিল ওখানে।''

"আর কী যেন বলতে বলতে থেমে গেলি?'' মা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন কুঁইমামাকে।

"আর কী। আমাকে খুশি করার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে খসখস করে একটা লাখ টাকার চেক লিখে সাহেব আমার হাতে দিল।" কথা শেষ করেই মায়ের দিকে তাকিয়ে কুঁইমামা শব্দ করে হাসতে লাগলেন।

এতক্ষণ পরে কুঁইমামার গলায় সেই 'কুঁই কুঁই' হাসির শব্দ! এবার নতুন করে দেখতে লাগলাম কুঁইমামাকে।

ছবি অলোক ধর

বেড়া দিচ্ছিস কেন?
বাগানটা যাতে সুন্দর দেখায়, সেইজন্যে।

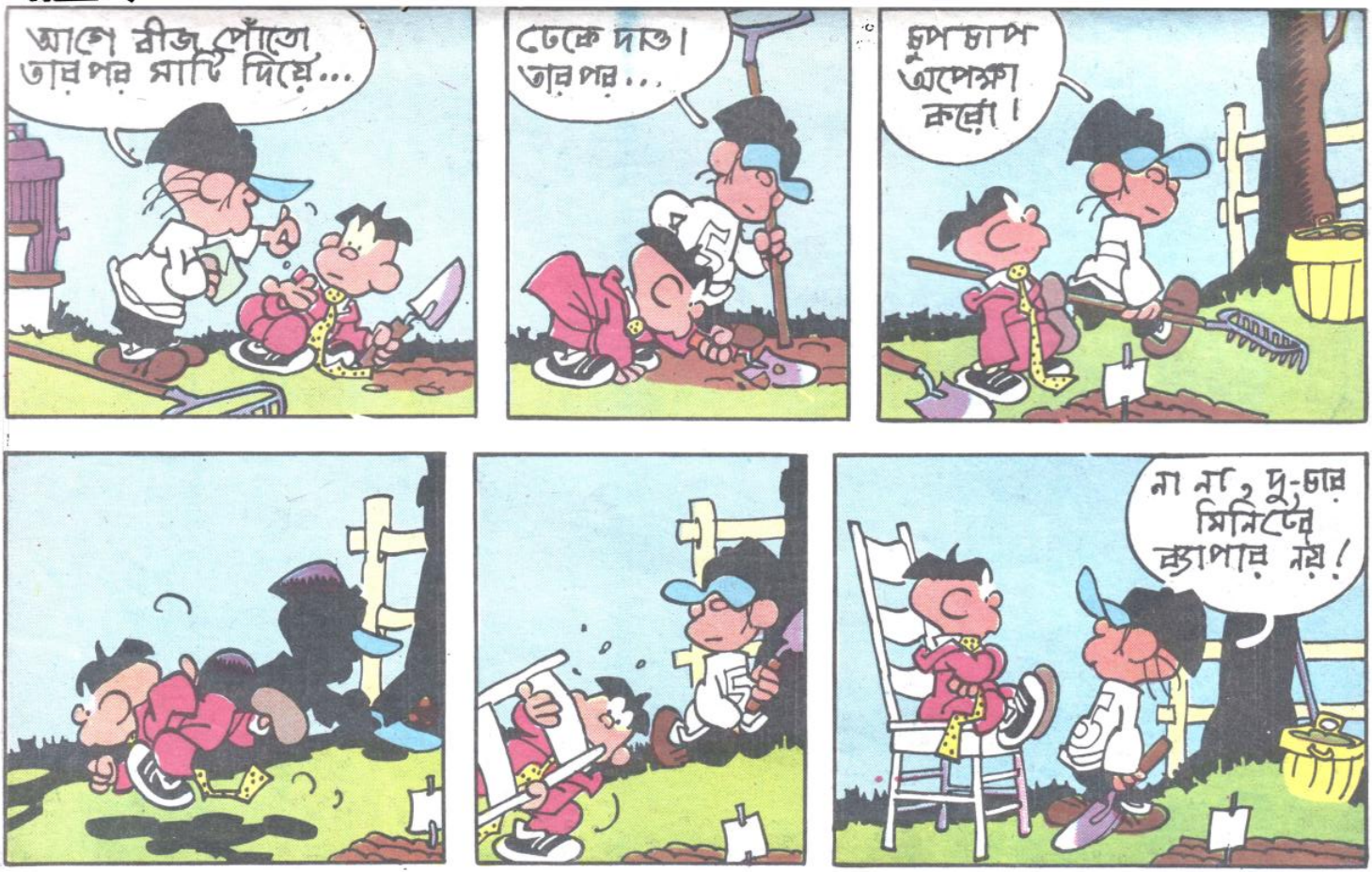

আগে বীজ পোঁতো
তারপর মাটি দিয়ে...
ঢেকে দাও।
তারপর...
চুপচাপ অপেক্ষা করো।
না না, দু-চার মিনিটের ব্যাপার নয়!

মিত্র ইনস্টিটিউশনের (মেন) প্রধান-শিক্ষক কী বলেন

দৃশ্যত বিশ্বেশ্বর মিত্রের একমাত্র পুত্র নির্মলের সুশিক্ষা। কিন্তু 'উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।' তাই তিনি দমদমের অ্যামিউনিশন ফ্যাক্টরির চাকরির কাল উত্তীর্ণ হবার আগেই অবসর নিয়ে, আর দুটি বাড়ির একটি বিক্রি করে দিয়ে স্কুলের পত্তন করলেন

১৮৯৮ সালে। ১৯০৫ সালে যখন স্যার আশুতোষ আর আলেকজান্ডার পেডলার স্কুল পরিদর্শন করতে আসেন, খুশি হয়ে বিশ্বেশ্বর মিত্রকে আশুতোষ বলেন, "তোমার ছেলের জন্যে একটা ভাল স্কুল করেছ মধ্য কলকাতায়, আমার ছেলের জন্যে একটা করো!" স্যার আশুতোষের কথা কি ফেলা যায়! তাই ভবানীপুরেও মিত্র ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হল।

নির্মলচন্দ্র কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেছিলেন, উত্তরকালে ইংরেজি শব্দভাণ্ডারের বিখ্যাত বই 'স্টাডিজ ইন ওয়ার্ডস' লিখে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন—অথচ তিনি ছিলেন অঙ্কের এম এস-সি। প্রথমবারেই এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তৃতীয় স্থানটি দখল করল মিত্র মেন। পরে অনেক স্ট্যান্ড ও স্কলারশিপে মিত্র মেন-এর ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে গেছে।

পিতামহের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের পরিচালনা-ভার এখন বিভাসচন্দ্র মিত্রর হাতে। বলাবাহুল্য, উনিও এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৯৪৫-এ সহকারী প্রধান-শিক্ষক হন। ১৯৬২তে প্রধান। বিষয় মুখ্যত ইতিহাস হলেও ইংরেজি পড়াশোনা নিয়ে বিশেষ চিন্তা করেন। যার জন্যে নিজ ব্যয়েই লীডস গিয়েছিলেন শিক্ষাদান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। পরে ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকার উইসকনসিন ইউনিভার্সিটিতে।

শ্রী মিত্রের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা হল। 'ভাল' নম্বর পাওয়া নিয়ে। যার আজকাল এত অভাব। প্রথমেই উনি গুরুত্ব দিলেন ভাল হাতের লেখার উপর। বললেন, হাতের লেখা যদি খারাপ হয়, যত ভাল ছেলেই হোক কিছুতেই লেটার মার্কস পাবে না। এরপর জোর দিতে হবে লিখিত উত্তরে পয়েন্টসের পারম্পর্য বা ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উপর। এই উদ্দেশ্যে উত্তরটিকে সার্থকভাবে পৃথক পৃথক প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদে ভাগ করতে হবে। আর মার্জিনে পয়েন্টসের উল্লেখ করতে পারলে আরও ভাল।

ভাল নম্বর পাওয়ার আর-একটা বড় শর্ত হল উপযুক্ত প্রশ্ন বেছে নেওয়ার ক্ষমতা। বহুক্ষেত্রেই যেটা ছাত্রদের থাকে না। অনেক প্রশ্ন আছে, যার উত্তরে কম লিখে ভাল নম্বর পাওয়া যায়। আবার অনেক প্রশ্ন আছে, যার উত্তরে প্রচুর লিখেও মামুলি নম্বরের বেশি পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রথম ধরনের উত্তর লেখাই ভাল। অবশ্যই ক্লাসে শিক্ষকরা ছাত্রদের বুঝিয়ে দেবেন কোন কোন প্রশ্ন পরীক্ষার হলে বর্জনীয়।

বললাম, আমাদের সময়ে মাঝে-মাঝে এক এক বিষয়ে এক-একটা আদর্শ প্রশ্নপত্র ঠিক করে নিয়ে ঘড়ি ধরে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে লিখে দেখতাম সব ঠিকমত লিখতে পারছি কিনা, কী কী ভুল হচ্ছে বা বাদ যাচ্ছে। আজকাল ছেলেমেয়েরা তেমন করে না? বিভাসবাবু শুধু হাসলেন। যার মানে হয়তো : তাহলে আর ভাবনা ছিল না!

একটু পরে বললেন, আজকাল যে তিন নম্বরের সংক্ষিপ্ত সব প্রশ্ন দেওয়া হয়, সেখানে একেবারে টু-দা-পয়েন্ট উত্তর দরকার, কিন্তু

ছেলেমেয়েরা প্রায়ই গন্ধমাদন পর্বত বয়ে আনে। যেখানে চার-পাঁচ লাইনে উত্তর হয়ে যায়, সেখানে একপাতা লিখে ফেলে মনের আনন্দে।

যেমন?

"যেমন, 'সিপাহী বিদ্রোহের কারণ কী?' এই প্রশ্নে তিন নম্বর থাকলে বুঝতে হবে প্রত্যক্ষ কারণটি অর্থাৎ এনফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তন এবং টোটা, কার্তুজ সম্পর্কে সিপাহীদের বিরূপ মনোভাব থেকে কীভাবে বিদ্রোহটা ছড়িয়ে পড়ে—এটাই খুব অল্প কথায় গুছিয়ে লিখতে হবে।

"আসলে প্রশ্নের আকারটা কী, কী চাওয়া হচ্ছে সেটা বুঝতে হবে। উত্তরের পয়েন্টস সবার মোটামুটি একই, কিন্তু প্রশ্ন তো হাজার রকমের হতে পারে? কাজেই প্রশ্নে যেমন-যেমন চাওয়া হয়েছে উত্তরে যদি পয়েন্টসের ঠিক সেইমতো বিন্যাস না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে, পরীক্ষার্থী না- বুঝে মুখস্থ লিখেছে। অথচ মজার কথা, তার উত্তরে হয়তো সব পয়েন্টই আছে। কিন্তু অ্যারেঞ্জমেন্ট বা প্রেজেন্টেশন ঠিক হল না।"

ইংরেজিতে ফেলের সংখ্যা সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে বেশি, কিন্তু ভাল ছাত্রদের পক্ষে নম্বর তোলা সহজ। স্ট্রাকচারাল মেথডে অভ্যস্ত না হওয়ায় ছেলেমেয়েরা ইংরেজিতে ভাল করতে পারছে না। এখন যে ধরনের প্রশ্ন হচ্ছে তাতে বই মুখস্থ করে হয় না। টেক্সট ভাল করে পড়তে হবে, শুধু ইংরেজিতে অন্তত সিম্পল সেন্টেন্স লিখতে হবে। "দেখবেন, কম্পোজিশন অংশেই ছেলেরা মার খেয়ে যায়—প্রানস্লেশন, সাবসট্যান্স বা সামারি, প্যারাগ্রাফ রচনা ইত্যাদিতে কিন্তু টেস্ট পেপার্স করে- করে গ্রামারটায় ভাল নম্বর পায়। এর একমাত্র প্রতিকার হল নিজে লেখা। এবং টেক্সট ভাল করে পড়া।"

শেষে বললেন, ধারণা পরিষ্কার রাখাটাই আসল কথা। যে-কোনও বিষয়েই। মুখস্থ করে পাস করা হয়তো যেতে পারে, কিন্তু ভাল নম্বর পাওয়া যায় না।

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় সঞ্জীব সরকার মিত্র মেন-এর ফুটবল টীমের নিয়মিত গোলকীপারও। যদিও ওর বাবা সুধীরময় সরকার ওকে ময়দানে খেলা দেখতে যেতে দেন না। সুধীরবাবু কাজ করেন ডি ভি সি-তে, সঞ্জীবের মা রেলে।

সঞ্জীব ক্লাস সেভেন থেকে ফার্স্ট হয়ে আসছে। পরীক্ষার জন্যে ওর প্রস্তুতি অনেক আগেই আরম্ভ হয়ে গেছে। দিনে ছ'ঘণ্টা থেকে সাড়ে ছ'ঘণ্টা পড়ে, ছুটির দিন আর একটু বেশি। ও ভাল করে টেক্সট বই পড়ে নিয়ে মনে মনে জিনিসটা বুঝে নেয়। পরে টেস্ট পেপার্স থেকে প্রশ্ন ঠিক করে নিয়ে উত্তর লিখে ফেলে। উত্তর দেখিয়ে নেয় স্কুলের শিক্ষকদের বা গৃহশিক্ষকের কাছে।

সঞ্জীব একাধিক বইয়ের সাহায্য নেয়। স্কুলের পাঠ্যতালিকায় যে-সব বই আছে ও তার বাইরে প্রচুর রেফারেন্স বই পড়ে। ইংরেজিতে নেসফিল্ড, রেন-মার্টিন, বাংলায় পি আচার্য, জগদীশ ঘোষ, অঙ্কে কে সি নাগ, দাশ-বর্মন, নরেশ সমাজপতি, ফিজিক্যাল সায়েন্সে চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত ও সমর গুহ, হায়ার সেকেন্ডারির বইগুলি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান

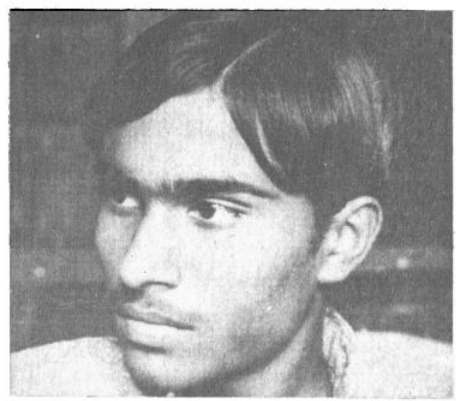

পরিষদ, অসিত দাস ও জে এন রায়। লাইফ সায়েন্সে কমু দাস কুণ্ডু, হরিদাস গুপ্ত, ডাঃ অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী, রবীন পাল, ডাঃ তারক-মোহন দাশ ও মেদ্দা-মুখোপাধ্যায়। ইতিহাসে অধ্যক্ষ কিরণ চৌধুরীর লেখা ও অন্যান্য ডিগ্রী ক্লাসের বই, প্রভাতাংশু মাইতি ও নিমাইসাধন বসু। স্কুলে পড়ানো হয় বিভাস মিত্র ও সুপ্রীতি সান্যাল। ভূগোলে ডঃ শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, লোকেশচন্দ্র চক্রবর্তী, নীলোৎপল শ্যাম, বসু-ভট্টাচার্য এবং প্রশ্নোত্তরের একটি ভাল বই। সংস্কৃতে ব্যাকরণ কৌমুদী ও হেল্পস টু-দা-স্টাডি।

গাবলু ১
স্কাউটদের রোজই কিছু-না-কিছু পরোপকার করতে হয়।
পালিশ-ওয়ালা
পালিশ-ওয়ালা
চশমার দোকান
চশমার দোকান
দন্ত-চিকিৎসক

গাবলু
২
মাত্র একটা পিঠে খেয়েই তোর পেট ব্যথা করছে ? আশ্চর্য!

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সিঁড়ির ধাপ

বাঁ আর ডান দিকে রঙের আঁচড় কেটে দেখতে পেয়েছ দুদিকের সিঁড়ি-ধাপ। এবার নমুনায় দেখো (৪নং ছবি) এক সঙ্গে বাঁ আর ডান দিকের ধাপের কিছু অংশ মিলে সিঁড়ির কোনা। এই কোনা-সিঁড়ি আঁকার শেষে মাঝখানের দাগ মুছে দিতে ভুলে যেও না (৩নং ছবি)।

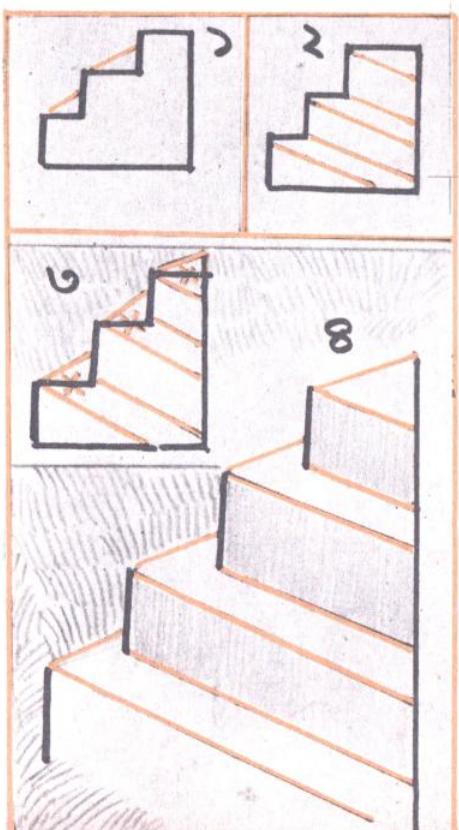

কারিগর

কাচের ফুলদানি

বাড়িতে অনেকেই জ্যাম বা আচারের মুখ-বড় খালি বোতল ফেলে না দিয়ে তার থেকেই বেছে নাও একটিকে ফুলদানির জন্যে। জোগাড় করো তুলি, তেল-রং, ক্রাইলিন রং আর কেরোসিন। শুরু করো—প্রথমে বোতল ভাল করে ধুয়ে শুকিয়ে নিয়ে যে-কোনো গাঢ় তেল-রং দিয়ে ভেতরটা ভাল করে রঙ করে নাও। এবার বোতলের বাইরের গায়ে তোমার ইচ্ছেমতো নানান রঙিন নকশায় ভরিয়ে দাও।

জেনে রাখোঃ(১) ভেতরে রং করার পর দিন-দুই শুকোবার জন্যে সময় দাও। (২) বাইরের নকশা ফেবরিক রঙ দিয়ে করতে পারো। (৩) তেল-রঙে তুলির কাজ শেষ হলে কেরোসিন দিয়ে ভাল করে না ধুলে তুলির ডগা শক্ত হয়ে যাবেই।

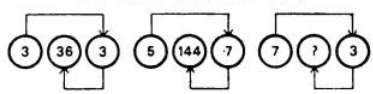

তোমাদের উত্তর আর সেই সঙ্গে ক্যাডবেরীস্ জেমসের একটি খালি বড় (৩০ গ্রামের) প্লাস্টিক প্যাকেট পাঠিয়ে দিও। প্রথম ১০০১ জন যারা সঠিক উত্তর পাঠাবে, তারা প্রত্যেকে ১১ টাকার স্টেট ব্যাঙ্ক গিফ্‌ট চেক পাবে।

এই ঠিকানায় পাঠাও: "Fun with Gems" Dept. No. D22
Post Box No. 56, Thane 400 601. Maharashtra.

রঙ-বেরঙের চকলেটে ভরা ক্যাডবেরীস্ জেমস্

CHAITRA-C-263 BEN

শত্রুর বিনাশ

শত্রুদন্ত-ভক্ষক (COOH*) দন্ত-প্রদেশ বিনাশের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী সেনা-দলকে প্রশিক্ষিত করছে।

সেনাপতির কাছে সমাচার পৌঁছলো।

বিনাকা-এফ'কে এখুনি আমাদের ডেকে পাঠানো উচিত। আমাদের যে যুদ্ধের হাতিয়ারের অভাব, দন্ত-ভক্ষক তা জানে।

বিনাকা-এফ যুদ্ধের এই আহ্বানকে স্বীকার ক'রে নিল।

বিনাকা ফ্লোরাইড টুথপেস্ট ও বিনাকা টুথব্রাশের সাহায্যে আমরা নীচ দন্ত-ভক্ষককে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেব।

দন্ত-প্রদেশের নিয়মিত সেনারা দিনরাত যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

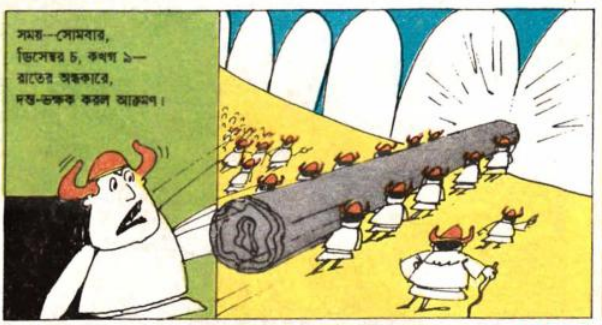

সময়—সোমবার, ডিসেম্বর ৮, কথগ ৯— রাতের অন্ধকারে, দন্ত-ভক্ষক করল আক্রমণ।

কিন্তু বিনাকা-এফ ও দন্ত-প্রদেশের সৈন্যেরা মিলে মোক্ষমভাবে তাদের প্রতিরোধ করল।

পালাও সবাই! নয়তো মারা পড়ব!

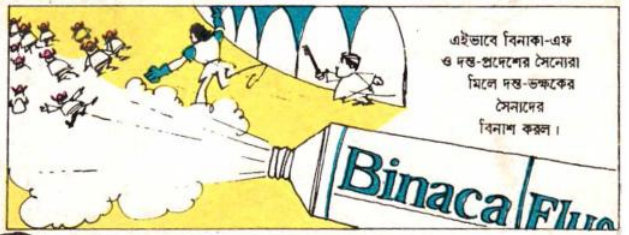

এইভাবে বিনাকা-এফ ও দন্ত-প্রদেশের সৈন্যেরা মিলে দন্ত-ভক্ষকের সৈন্যদের বিনাশ করল।

দন্ত-প্রদেশের সেনাদের এ এক মহান বিজয়!

এর সমস্ত কৃতিত্ব হচ্ছে উৎকৃষ্ট হাতিয়ার ও প্রশিক্ষণের তার মানে বিনাকা ফ্লোরাইড ও বিনাকা টুথব্রাশের।

* দাঁতের এনামেল নষ্ট ক'রে দাঁতে বস্তুশাদায়ক গর্ত সৃষ্টিকারী কার্বোক্সিল অ্যাসিড গ্রুপের ফর্মুলা।

বেশী মজবুত দাঁতের জন্যে, দন্ত-ক্ষয় বন্ধ করার জন্যে—বিনাকা ফ্লোরাইড